দেশপ্রেমী বীরেশ্বর

মায়ের কাছেই তো সন্তান শুনবে রূপকথার কাহিনী, যেমন রূপকথা একদা তৈরি হয়েছিল এই বাংলাদেশের মাটিতেই। কত শত রাজকুমার ঝাঁপ দিয়েছিল রাক্ষস-বধের সংগ্রামে, শত্রুর হিংস্র নখরে ছিন্নভিন্ন হয়েছিল কত প্রাণ, তবুও তো মরণজয়ী লড়াইয়ে অটল ছিল বাংলার দামাল ছেলের দল। রক্তের সাগরে ডুব দিয়ে তারা ভেঙেছিল পাতালপুরীর নিগড়, মুক্তি পেয়েছিল আঁধারে বন্দী রাজকন্যা, আমাদের স্বাধীনতা। রাক্ষস-বধের সেই বীর কাহিনী, নবীন রাজকুমারদের ত্যাগের মহিমা, গোটা জাতির অবিস্মরণীয় জাগরণ, সেসব ইতিহাস আজকের কিশোরদের শুনিয়েছেন জাহানারা ইমাম। দেশমাতার কথা দেশের সন্তানদের কাছে বলবার জন্য তাঁর চেয়ে যোগ্য আর কে আছে! তিনি শহীদ রুমীর মা, *একাত্তরের দিনগুলি* বইয়ের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের আলোকমশাল জ্বালিয়েছেন লক্ষপ্রাণের গভীরে। তাঁর জীবন, তাঁর কর্ম, তাঁর রচনার সুবাদে তিনি হয়ে উঠেছেন অযুত মুক্তিযোদ্ধার মা, লাখো শহীদের জন্য অপার বেদনা ও গণহন্তারক ঘাতকদের প্রতি তীব্র ঘৃণা বুকে বহন করে তিনি যেন মাতৃস্বরূপা দেশজননী। *একাত্তরের দিনগুলি* বইয়ের কিশোর-ভাষ্য এযুগের রাজকুমার অগণিত নবীন পাঠকের কাছে সহজিয়া ভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন এখানে তিনি। সেই সঙ্গে মিলিয়ে রঙে-রেখায় গোটা বই সাজিয়েছেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। মুক্তিযুদ্ধকে জানা-বোঝার চেষ্টার সুবাদে নবীনকিশোররা মানুষ হয়ে ওঠার সাধনায় পাবে নবতর শক্তি। আর সেই জন্যই তাদের হাতে তুলে দেয়া হলো এই গ্রন্থ—যারা দেখেনি মুক্তিযুদ্ধ তাদের জীবনসত্যের বই, নিজস্ব এক মুক্তিযুদ্ধের বই।

ISBN-984-12-0033-3

বিদায় দে মা ঘুরে আসি

বিদায় দেশ

ঘুরে আসি

জাহানারা ইমাম

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী

প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন : কাইয়ুম চৌধুরী

দ্বিতীয় মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯, জুন ১৯৯২

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯৫, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

স্বত্ব : সাইফ ইমাম (জামী)

Bidai De Ma Ghure Ashi

A short narration of guerrilla warfare in Dhaka during the liberation war of 1971, written for juvenile readers. Based on the book "The Days of 1971" (Ekattorer Dinguli) by Jahanara Imam

ISBN-984-12-0033-3

মূল্য : পয়তাল্লিশ টাকা

প্রকাশক : মফিদুল হক, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

হরফ বিন্যাস : জাতীয় কম্পিউটার মুদ্রায়ণী, ৫১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

মুদ্রক : বেইস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ১৪০ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০

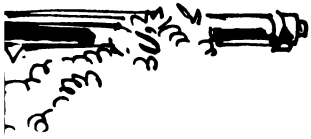

উৎসর্গ

বাংলাদেশের ছেলেমেয়ে,
যারা ১৯৭১ সালের পরে জন্মগ্রহণ করেছে,
যারা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ দেখে নি,
তাদের উদ্দেশে ——

ভূমিকা

এখন যারা শিশু-কিশোর, তারা কেউই ১৯৭১ সালে জন্মগ্রহণ করে নি। ১৯৭১ সালে যে একটি মহান, পবিত্র মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে তারা বিস্তারিত কিছু জানে না বললেই হয়। তারা শুধু এটুকু জানে—একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, হানাদার বাহিনীর কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর। ব্যস্, এই পর্যন্তই। কিসের মুক্তিযুদ্ধ, কেন মুক্তিযুদ্ধ, কারাই বা হানাদার বাহিনী—সে সবের কোন ব্যাখ্যা এই প্রজন্মের শিশু-কিশোররা জানবার খুব একটা সুযোগ পায় না। মুক্তিযুদ্ধের ওপর কিছু বই লেখা হয়েছে, কিন্তু তা প্রধানত বড়দের জন্য। ছোট ছেলেমেয়েদের বোঝবার মতো সোজা সরলভাবে লেখা বইয়ের সংখ্যা খুবই কম।

১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে যাঁরা ঢাকায় ছিলেন, তাঁদের জীবনযাপনের কাহিনী, তাঁদের আতঙ্কের ও যন্ত্রণার কাহিনী; ঢাকায় তৎপর গেরিলাদের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতা ও প্রতিরোধের কাহিনী বিধৃত হয়েছে 'বিদায় দে মা ঘুরে আসি' বইটিতে। সারা বাংলাদেশের সীমান্ত ঘিরে এগারোটি সেক্টরের যুদ্ধের কাহিনী এই বইয়ের বিষয়বস্তু নয়। ঢাকায় যা ঘটেছিল, তা ঐ সামগ্রিক যুদ্ধপরিস্থিতির একটা বড় অংশ। সেই অংশের অর্থাৎ ঢাকায় সংঘটিত ঢাকাবাসী ও গেরিলা বাহিনীর সম্মিলিত প্রতিরোধের কিছু কাহিনী চিত্রিত হয়েছে এই বইতে।

'বিদায় দে মা ঘুরে আসি' বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি আগ্রহী করে তুলবে বলে আশা রাখি। সেই আগ্রহ নিয়ে তারা নিজেদের মনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করবে, বড় হ'তে হ'তে তারা মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা আরো অনেক বই পড়বে এবং তাদের দেশের সবচেয়ে গৌরবময়, সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে।

জাহানারা ইমাম

ঢাকা
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৮
১ পৌষ, ১৩৯৫

বিদায় দে মা ঘুরে আসি

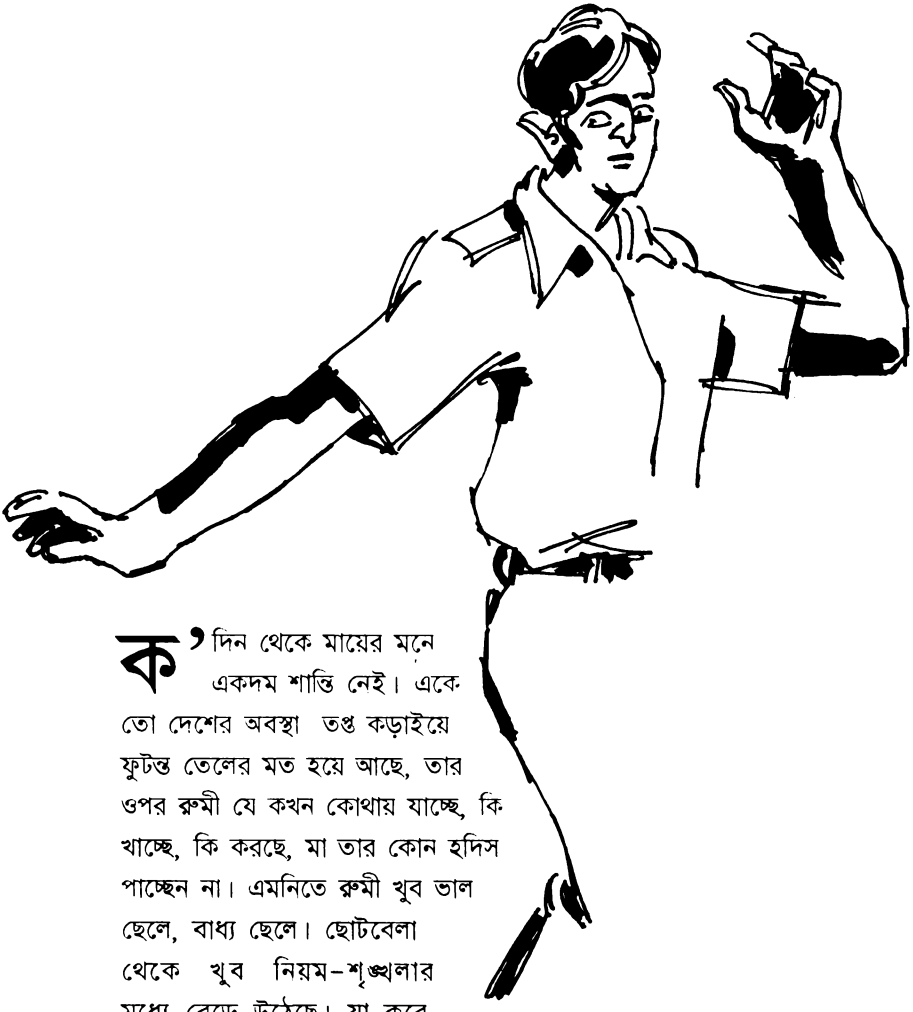

ক'দিন থেকে মায়ের মনে একদম শান্তি নেই। একে তো দেশের অবস্থা তপ্ত কড়াইয়ে ফুটন্ত তেলের মত হয়ে আছে, তার ওপর রুমী যে কখন কোথায় যাচ্ছে, কি খাচ্ছে, কি করছে, মা তার কোন হদিস পাচ্ছেন না। এমনিতে রুমী খুব ভাল ছেলে, বাধ্য ছেলে। ছোটবেলা থেকে খুব নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে বেড়ে উঠেছে। যা করে, মা-বাবাকে বলেই করে। এখনো বলেই করছে। যেখানে যাচ্ছে ও-বলেই যাচ্ছে ; কিন্তু তবু তার এই রকম ছোটাছুটি দেখে মা-ও দিশেহারা হয়ে উঠেছেন। এই রকম গোলমেলে ব্যাপারটা শুরু হয়েছে পহেলা মার্চ থেকে। সেদিন ঢাকা স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল। আন্তর্জাতিক একাদশ আর পাকিস্তান একাদশের মধ্যে। সবগুলো গ্যালারী লোকে লোকারণ্য, সবাই তন্ময় হয়ে খেলা

দেখছেন। দর্শকদের মধ্যে অনেকেই ছোট ট্রানজিস্টার রেডিও সঙ্গে নিয়ে গেছেন খেলা দেখার সঙ্গে সঙ্গে ধারাবিবরণী শুনবেন বলে। বেলা একটার সময় রেডিও থেকে ধারাবিবরণী দেয়া বন্ধ হল। একটা পাঁচ মিনিটে সংবাদ প্রচারের সময় সুদূর ইসলামাবাদ থেকে বেতার-তরঙ্গে ভেসে এল সেই কঠিন ঘোষণা : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ক'রে দিয়েছেন। ব্যস্। আর যায় কোথা ! চারদিকে মহা শোরগোল প'ড়ে গেল। এত যে প্রিয় খেলা ক্রিকেট, সেই খেলা বাদ দিয়ে, চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার দর্শক 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিতে দিতে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। রুমী-জামীও খেলা দেখতে গিয়েছিল। তারাও জনতার সঙ্গে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। কাছেই দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় ওদের বাবার অফিস—দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড। ওখানে জামীকে বাবার কাছে রেখে রুমী ছুটল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। সেখানেও একই ঘটনা। রেডিও'র ঘোষণা শোনামাত্র ছেলেরা সবাই দলে দলে ক্লাস থেকে, হল থেকে বেরিয়ে বটতলায় জড়ো হতে শুরু করেছে। বটতলায় পৌঁছে রুমী দেখে, তখনো হাজার হাজার ছেলে চারদিক থেকে ধেয়ে আসছে। তার মনে হ'ল, সমুদ্রের একেকটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বটতলায়।

এমনি বিক্ষোভে সেদিন ফেটে পড়েছিল সারা ঢাকা শহর। উনিশশো একাত্তর সালের সেই পহেলা মার্চে।

রুমীর মা দেড়টার আগে পর্যন্ত এতসব কাণ্ডের কথা জানতে পারেন নি। তিনি গিয়েছিলেন নিউ মার্কেটে, পূর্ব পাকিস্তানে তৈরি সাবান, তেল, টুথপেস্ট, বাসন-মাজা পাউডার, এসব খুঁজতে। কিন্তু মজার ব্যাপার এসব একটা জিনিসও পূর্ব পাকিস্তানে তৈরি হয় না। সব পশ্চিম পাকিস্তানে তৈরি হয়ে এদিকে আসে এবং বাঙালিদের সেগুলোই কিনতে হয়। বাঙালিরা চেষ্টা করেও ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিতে পারে না। অথচ সোনালি আঁশ পাট উৎপন্ন হয় একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানেই, পাকিস্তানের বেশির ভাগ রাজস্বের টাকা আসে পূর্ব পাকিস্তান থেকেই। কিন্তু সোনালি আঁশ বেচা টাকা পূর্ব পাকিস্তানের উন্নতির জন্য খরচ না হয়ে তা খরচ হয় পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতির জন্য। গত তেইশ

বছর ধ'রে প্রতিটি খাতে এইরকম বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা চলে আসছে। এর জন্য গত কয়েক বছর ধ'রে বাঙালিদের মধ্যে অসন্তোষ আর আন্দোলন। উনসত্তর সালে সে আন্দোলন তুঙ্গে উঠে গণ-অভ্যুত্থান ঘটায়। স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের পতন হয় এবং ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন। তাতেও কোন স্থায়ী ফল হয় নি। গত বছর নভেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানে যে মহা সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল, তাতে বাঙালিদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, তার প্রতি ইয়াহিয়া সরকারের উপেক্ষা ও সাহায্য দেওয়াতে গড়িমসি বাঙালি জাতিকে আরো ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। গত বছর ডিসেম্বরে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অনেক বেশি ভোট পেয়ে জিতেছে। নিয়মমাফিক তাদেরই মন্ত্রিসভা গঠন করার এবং শেখ মুজিবের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। কিন্তু তাহলে যে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের মুশকিল হয়ে যায়। তাই গত দু'মাস থেকে নানা টালবাহানা করছে তারা। বাঙালিরাও আরো ক্ষিপ্ত হয়ে আন্দোলন জোরদার করছে। ইয়াহিয়া খান শেষ পর্যন্ত ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বসার তারিখ স্থির করেছিলেন।

মা বাড়ি ফিরে রুমীর বাবার ফোনে জানতে পারলেন, ইয়াহিয়া সেটাও আজ বাতিল করে দিয়েছেন আর তার ফলে স্টেডিয়ামে খেলা পণ্ড ক'রে দর্শকরা বেরিয়ে গেছে। বাবা তিনটের সময় জামীসহ বাড়ি ফিরে মাকে আরো খবর দিলেন। অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা শুনে অফিস-আদালত থেকেও সব লোকজন বের হয়ে আসে। শেখ মুজিব সেদিন সকাল থেকেই হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির মিটিং করছিলেন। ইয়াহিয়ার ঘোষণার এক ঘন্টার মধ্যে পঞ্চাশ-ষাট হাজার লোক বাঁশের লাঠি আর লোহার রড ঘাড়ে নিয়ে মিছিল ক'রে হোটেল পূর্বাণীর সামনের সবগুলো রাস্তা জ্যাম করে ফেলে। মতিঝিল, স্টেডিয়াম, বায়তুল মোকাররম, সব জায়গার দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। অফিসেও আর কোন লোক নেই।

সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়, রুমীর দেখা নেই। মার মনে উদ্বেগ দানা বাঁধছে। রুমী এল রাত আটটারও পরে। তার মুখে আরো খবর জানা গেল। শেখ মুজিব দুপুর আড়াইটেয় হোটেল পূর্বাণীতে জরুরী সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ঘোষণা দিয়েছেন—আগামীকাল থেকে রোজ ছয়টা-দুটো হরতাল আর ৭ই মার্চ রেসের ময়দানে সভা। বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় দুটোর সময় ছাত্রলীগ আর ডাকসুর নেতারা মিলে তিনটেয় পল্টন ময়দানে মিটিং ডাকেন। সাংবাদিক সম্মেলন শেষ ক'রে শেখ মুজিবও পল্টনের জনসভায় যান। সেখানে এত যে লোক হয়েছিল, সে আর বলার কথা নয়। সারা শহর যেন তপ্ত খোলায় খইয়ের মত ফুটছে। কেউ আর ঘরে নেই।

গুলিস্তানের মোড়ে কামানের ওপর দাঁড়িয়ে মতিয়া চৌধুরী আগুন-ঝরা বক্তৃতা দিয়েছেন। সেখানেও কামান ঘিরে চারপাশে বিশাল জনতা। রুমী সারাদিন বন্ধুর হোন্ডার পেছনে চড়ে সবখানে টহল দিয়েছে। স্টেডিয়াম থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, সেখান থেকে পূর্বাণী, পূর্বাণী থেকে গুলিস্তান মোড়ের কামান, সেখান থেকে পল্টন—এমনি করে চরকি-ঘোরা ঘুরেছে। খাওয়া হয় নি সারাদিন। শুধু রুমীর নয়, খাওয়া হয় নি সেদিন কারোও। খাওয়ার কথা কারই বা মনে ছিল।

এখন বাড়ি ফিরে খেয়ে-দেয়ে সবাই যে যার বিছানায়। কিন্তু মায়ের চোখে ঘুম নেই। রাত বারোটা পেরিয়ে গেছে, তবু এখনো অনেক দূর থেকে শ্লোগানের শব্দ আসছে। তার মানে এত রাতেও বহু লোক ঘরে ফেরে নি, বিছানায় যায় নি, হয়তো-বা খায়ও নি। ঘরের আরাম, দেহের বিশ্রাম সব হারাম করে তারা পথে পথে মিছিল করছে আর শ্লোগান দিচ্ছে। বাঙালি জাতির ন্যায্য দাবি, স্বাধিকার আদায়ের দাবিতে। পরদিন হরতাল। সকালে রুমী হেঁটে

হেঁটে বিশ্ববিদ্যালয় গেল, 'ডাকসু আর ছাত্রলীগ মিটিং ডেকেছে। যাই, একটু দেখে আসি।'
মা বারণ করেছিলেন, 'তোর এতসব মিটিংয়ে যাবার দরকারটা কি ? তুই তো আর কোন দলের মেম্বার নোস।'
রুমী জবাব দিয়েছিল, 'ব্যাপারটা এখন আর দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই আম্মা। এখন তো 'এ আগুন ছড়িয়ে গেছে সবখানে।'

কথাটা সত্যি। স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে সারা জাতি পথে নেমেছে। সারাদিন ধরে কতো মিটিং আর মিটিং শেষে লাঠিসোটা, কাঠ, রড ঘাড়ে নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল, সন্ধ্যার পরেও মশাল মিছিল। এইসব দেখেশুনে সরকার ২ মার্চ রাতে কারফিউ জারি করে। কিন্তু তাতে ফল হয় উল্টো। জনতা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে কারফিউ ভঙ্গ করার জন্য আবার পথে নামে, আরো বেশি করে শ্লোগান দেয়। রাতের স্তব্ধতা খান্‌খান্ হয় তাদের শ্লোগানে, তারপর শোনা যায় গুলির শব্দ। কারফিউ ভঙ্গকারী বাঙালির ওপর মিলিটারির গুলি।
তারপরের দিনও হরতাল, মিটিং, মিছিল। আগের রাতের গুলি-খাওয়া লাশগুলো মিছিলের সামনে বহন ক'রে জনতা পল্টন ময়দানের সভায় গেছে, সভার হাজার হাজার মানুষ শপথ নিয়েছে, শহীদদের স্বপ্ন তারা সফল করবেই। সভায় শেখ মুজিব সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। বলেছেন, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত বাঙালি জাতি একপয়সা ট্যাক্স-খাজনা দেবে না। তিনি সরকারকে বলেছেন, সেনাবাহিনীকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নিতে আর বাঙালি জনগণকে বলেছেন, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যেতে। মিটিং শেষে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে মিছিল শহীদ মিনারে লাশ রেখে আরেকবার শপথ নিয়েছে পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আদায়ের।
সারাদেশে বিক্ষোভ আর আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ। একদিকে যতই

সরকার কারফিউ আর সামরিক আদেশ জারি ক'রে, সৈন্যদের দিয়ে গুলি করিয়ে সে আন্দোলন দমন করতে চাইছে, অন্যদিকে ততই তা ফুঁসে উঠছে। আন্দোলন এখন জল-প্রপাতের গতি নিয়েছে, উঁচু পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ার বেগ সঞ্চয় ক'রে তা এখন একটা অনিবার্য পরিণতির দিকে ছুটে যাচ্ছে। তাকে রোধ করার ক্ষমতা বোধ হয় এখন আর কারো নেই। জনগণ এতদিন স্বাধিকারের আন্দোলনই করছিল, এখন সেটা মোড় নিয়েছে স্বাধীনতার আকাংক্ষার দিকে। স্বাধীন বাংলার নতুন পতাকাও তৈরি হয়ে গেছে। পল্টনের জনসভায় শেখের উপস্থিতিতে সে পতাকা উত্তোলন করাও হয়েছে।

রুমী সারাদিন বিভিন্ন মিটিং-মিছিলে ঘোরে আর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে মাকে এইসব খবর দেয়। মায়ের বুক দুরু দুরু করে। দেশে কি ঘটছে না ঘটছে, সে বিষয়ে মা নিজেও সচেতন, খবরের কাগজ খুঁটিয়ে প'ড়ে বিস্তারিত জানবার চেষ্টা করেন, লেখক-সাহিত্যিকদের সভা হলে তাতে যোগ দেন। কিন্তু রুমী বাইরে গেলেই মায়ের প্রাণটা যেন হাতে কাঁপতে থাকে। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে একটা গুলির ব্যবধান মাত্র, কখন আচমকা কোন্ দিক থেকে তীক্ষ্ণ শিসে ছুটে আসে, কে বলতে পারে ? ছোট ছেলে জামীকে নিয়ে অতটা উদ্বেগ নেই। সে রুমীর চেয়ে অনেক ছোট, স্কুলের ছাত্র, তাই তাকে মিটিং-মিছিলে যাবার অনুমতিই দেন নি মা। কিন্তু রুমী ক'দিন পরে উনিশ পেরিয়ে বিশ বছরে পা দেবে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এখন। তাকে তো আর ঘরে বেঁধে রাখতে পারেন না। কি যে জ্বালা হয়েছে মায়ের।

৭ মার্চ শেখ মুজিব রেসের ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিলেন। বললেন, 'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। তোমরা ঘরে ঘরে দুর্গ গ'ড়ে তোল। তোমাদের যার যা আছে, তাই নিয়ে তৈরি হয়ে যাও।'

সারাদেশ জুড়ে চলছে অসহযোগ আন্দোলন। প্রতিদিন সকাল ছ'টা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত হরতাল। শেখ মুজিব অফিস-আদালতের জরুরী কাজকর্ম চালানোর জন্য সরকারি, বেসরকারি সব অফিস আড়াইটে থেকে চারটে পর্যন্ত খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। রেশন দোকানও ঐ একই সময়ে খোলা। ব্যাঙ্কও তাই। আড়াইটে-

চারটের মধ্যে টাকা তোলা যাবে। শেখের প্রতিটি নির্দেশ সারাদেশ জুড়ে সবাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। জরুরী সার্ভিস হিসেবে হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তারের গাড়ি, সংবাদপত্র ও তাদের গাড়ি, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, দমকল, মেথর ও আবর্জনা ফেলা ট্রাক—এগুলোকে হরতাল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

১৫ মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় এসেছেন। ১৬ তারিখ থেকে শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর বৈঠক চলছে। প্রতিদিন শেখ মুজিব তাঁর সাদা গাড়িতে কালো পতাকা উড়িয়ে প্রেসিডেন্ট হাউসে যাচ্ছেন, বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বলছেন, আলোচনা চলছে, মীমাংসায় আসতে সময় লাগবে। তারপর ২১ মার্চ ভুট্টোও ঢাকায় এসেছেন। ঘন ঘন বৈঠক, আলাপ-আলোচনা চলছে। এই আলোচনা সম্বন্ধে মা খুব আশাবাদী। আলাপ–আলোচনা শেষে নিশ্চয় একটা সমঝোতা হবে, দেশের সংবিধান অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করবে, শেখ প্রধানমন্ত্রী হবেন। তারপরেই হবে ছয় দফার বাস্তবায়ন। পূর্ব পাকিস্তান পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পাবে। কিন্তু রুমীর ধারণা সম্পূর্ণ উল্টো। সে বলছে, আলোচনার ছুতো করে ইয়াহিয়া সরকার সময় নিচ্ছে। তাদের নিশ্চয় অন্য কোন বদ মতলব আছে। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সেনাবাহিনীর প্রধান, প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার এবং আরো কয়েকজন মেজর জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ার এসেছেন। বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে এত সেনাপতি, সামন্ত সঙ্গে আনার মানে কি ? তাছাড়া, প্রতিদিন প্লেনে করে সাদা পোশাকে প্রচুর সৈন্য এসে নামছে ঢাকা এয়ারপোর্টে। চাটগাঁ বন্দরে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ এসে ভিড়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। এসব কিসের আলামত ? আম্মা, তুমি বুঝতে পারছ না, মুজিব–ইয়াহিয়া আলোচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এটা ওদের সময় নেবার অজুহাত মাত্র। আমাদের যে দাবি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, তা তো ওরা দেবেই না, বরং ওরা, গত তেইশ বছর

যেমন পূর্ব পাকিস্তানকে ওদের উপনিবেশ বানিয়ে রেখেছে, এখনও ঠিক তাই করবে।'

মায়ের বিশ্বাস হয় না। 'কিন্তু ওরা তা করবে কি করে ? দেখছ না, সারাদেশের জনগণ কিভাবে জেগে উঠেছে ? প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, আন্দোলন করছে ?' রুমী দুঃখের হাসি হেসে বলে, 'হায় গো মা-জননী। ওরা সময় নিচ্ছে মাত্র। ভেতরে ভেতরে ওরা অন্য কিছুর প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই কয়েকটা দিন বাঙালির এইসব লাঠিসোটা ঘাড়ে মিছিল আর শ্লোগান সহ্য করে যাচ্ছে।'

মা হেসে উড়িয়ে দেন, 'তোর যত সব আজগুবি কথা। মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা যদি ব্যর্থ হয়ও, তাহলেও যেভাবে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলছে, তাতে জনগণ তাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ঠিকই আদায় করে নেবে।'

কিন্তু মায়ের আশা পূরণ হয় না। রুমীর আশঙ্কাই সত্যি হয়ে যায়। ২৫ মার্চ রাত বারোটার পর। মা ধারণাও করতে পারেন নি যে এ রকম হতে পারে। দু'দিন আগেও তো ২৩ মার্চ প্রতিরোধ দিবস পালিত হল, ঢাকার সব বাড়িতে কালো পতাকার পাশাপাশি স্বাধীন বাংলার নতুন পতাকা উড়তে দেখেছেন, নিজেরাও উড়িয়েছেন ; কই, সেদিনও তো কিছু মনে হয় নি যে এমন কল্পনার অতীত মহা সর্বনাশের ব্যাপারে ঘটতে যাচ্ছে ? পূর্ব পাকিস্তান এখনও তো পাকিস্তানেরই একটা অংশ—কি ক'রে সরকার নিজের দেশেরই একটা অংশের লোকদের ধ্বংস করার জন্য তাদের ওপর সেনাবাহিনী নামিয়ে দিতে পারে ? কি ক'রে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে, বাজার-হাট পুড়িয়ে, ঘুমন্ত নিরীহ মানুষের ওপর গুলি চালিয়ে এরকম নারকীয় কাজ করতে পারে ? ২৫ মার্চ কালরাত্রির এই গণহত্যার কোন নজির নেই পৃথিবীর কোথাও। এটা করবার জন্যই ওরা সময় নিচ্ছিল, নিজেদের তৈরি করছিল, আর বাইরে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাবার ভান করছিল। রুমীর কথাই তাহলে ঠিক হল ? এটাই তাহলে ঘটবার ছিল ?

রুমী বলেছিল, 'এখন আর স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নই ওঠে না। বাঁচতে হলে ওদের কাছ থেকে আমাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হবে সশস্ত্র সংগ্রাম ক'রে।'

রুমীর মত দেশের আরো বহু তরুণ এবং বহু বয়স্ক রাজনীতি-বিদও তাই মনে করতেন। কিন্তু মা তো আর সেটা জানতেন না, তিনি শিউরে উঠে বলেছিলেন, 'বলিস কিরে ? পাকিস্তান আর্মির আছে সবচেয়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করবি কি দিয়ে ?' 'কিছু নেই বলেই তো আরো ভয়। লাঠি ঘাড়ে মিছিল ক'রে, শ্লোগান দিয়ে, রাস্তায় ব্যারিকেড বানিয়ে আমরা স্বায়ত্তশাসনও পাবো না, জানেও বাঁচতে পারব না, এ তুমি দেখে নিও।' মা সেদিন রুমীকে বকেছিলেন, পানি ঢেলে মাথা ঠাণ্ডা করতে বলেছিলেন। আজ মা-ই মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন।

গোলাগুলির শব্দে চারদিক ফাটছে, জানালা দিয়ে তাকালেই দূরে দূরে আগুনের স্তম্ভ দেখা যায়, ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশ আড়াল করে ফেলেছে।

ফোনের লাইন কাটা। অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ। কারফিউ না দিলেই বা বেরোয় কার সাধ্যি! সামরিক আইন জারি হয়েছে। শেখ মুজিব বন্দী। আওয়ামী লীগ বেআইনী ঘোষিত।

৩২ ঘন্টা পর ২৭ মার্চ সকাল ৮টায় কারফিউ উঠল কয়েক ঘন্টার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে মা বেরিয়ে পড়লেন রুমীকে নিয়ে, বাবা গেলেন তাঁর সহকর্মীর সঙ্গে। কোথায় কি হয়েছে তাই দেখবার জন্য, আত্মীয়-বন্ধুদের খোঁজখবর নেবার জন্য।
বাঙালির এত গর্বের শহীদ মিনার আর নেই, বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গোলার আঘাতে উড়িয়ে দিয়েছে। ইকবাল হল ঝাঁঝরা, রমনা রেসকোর্সের কোণের সেই কালী মন্দির মাটিতে মিশে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী মধুর ক্যান্টিন পুড়ে ছাই, ছাত্রদের প্রিয় মধুদাও আর নেই। নেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক। গুলির আঘাতে সব শেষ। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বাঙালি পুলিশ বেশির ভাগ প্রাণ দিয়েছে, অল্প ক'জন পালাতে পেরেছে। পাক আর্মি ইত্তেফাক অফিস পুড়িয়েছে, পুড়িয়েছে দ্য পিপ্‌ল্ অফিস। ঢাকায় যত বস্তি আছে সব আগুনে পুড়ে ছাই, ছাই হয়েছে রায়ের বাজার, নয়া বাজার, ঠাটারী বাজার, শাঁখারি পট্টি। মানুষ যে কতো মরেছে, তার হদিস পাওয়া দুষ্কর। এখনো বহু জায়গায় গুলিবিদ্ধ অথবা আগুনে পোড়া লাশ পড়ে রয়েছে। বহু লোক হাসপাতালগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। হাজার হাজার লোক রিকশা, স্কুটারে জিনিসপত্র বোঝাই ক'রে শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। যারা রিকশা, স্কুটার পাচ্ছে না তারা কাঁধে হাতে সুটকেস, পোঁটলা নিয়ে হেঁটেই পালাচ্ছে। কোথায় পালাচ্ছে তাও হয়তো জানে না, শুধু জানে, এখান থেকে পালাতে হবে।
ঘটনার অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতার ঘোর কাটতে সবার বেশ কয়েকদিন সময় লাগে। প্রথম ৩২ ঘন্টা একনাগাড়ে মেরে-ধরে-জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে তারপর মিলিটারি একটু ক্ষান্ত দিয়েছে। এখন স'য়ে মারবার ফন্দি আঁটছে। সবকিছু স্বাভাবিক দেখাবার চেষ্টা করছে। বাইরের

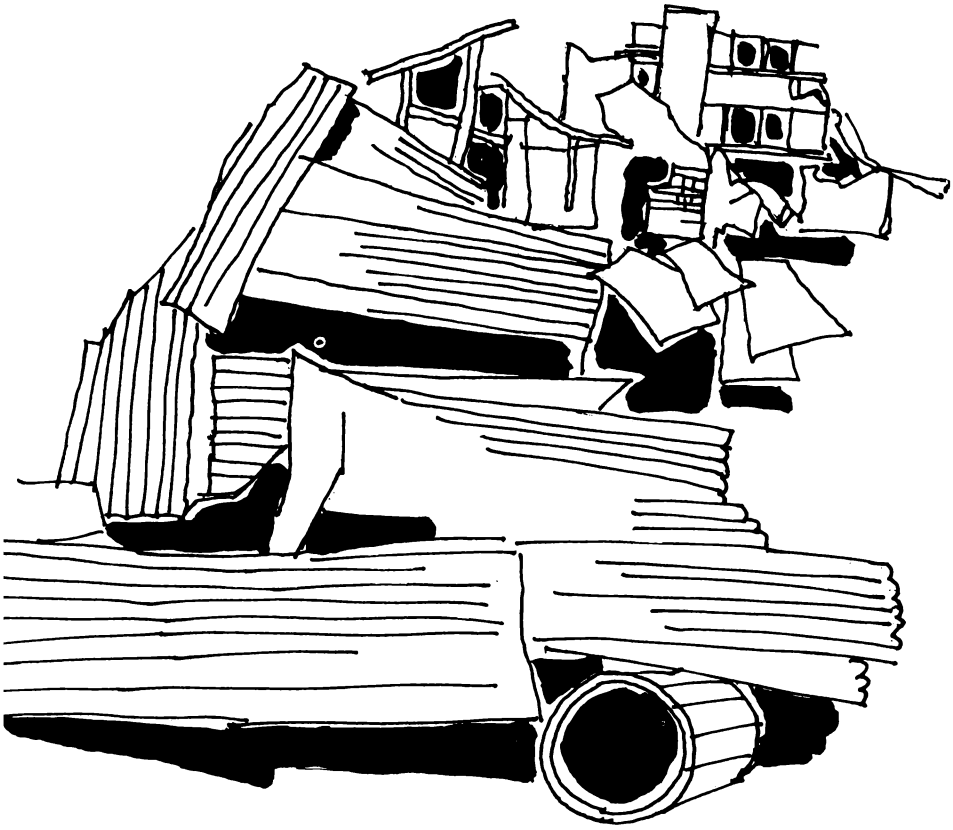

পৃথিবীকে দেখাবার চেষ্টা করছে, কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি দিয়ে সরকার পরিস্থিতি আয়ত্তে এনেছে। আল্লাহ পাকিস্তানকে রক্ষা করেছেন।

এখন প্রতিদিন খবর কাগজে নির্দেশ বেরোচ্ছে, সবাই যেন নিজ নিজ কাজে যোগ দেয়। রেডিও-টিভিতে ঠিকমত অনুষ্ঠান প্রচার করার হুকুম হয়েছে। যেখান থেকে পারো যেমন করে পারো, আর্টিস্টদের ধ'রে এনে প্রোগ্রাম চালাও। চাকরিজীবী প্রযোজক, পরিচালকরা প্রাণের ভয়ে তাই করছেন।

এখন মিলিটারি ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে। ঢাকা থেকে পালানো মানুষ যেসব জায়গায় জড়ো হয়েছে, সেসব জায়গায় একের পর এক গোলাগুলি চালিয়ে, আগুন লাগিয়ে, ছারখার করে দিচ্ছে—জিঞ্জিরা, বিক্রমপুরের সৈয়দপুর, কুমিল্লার শ্রীরামপুর। তারপর তারা ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন জেলায় যাচ্ছে, যাবার পথে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে, মেশিনগানে মানুষ মারতে মারতে যাচ্ছে।
২৫ মার্চের উন্মত্ত হত্যাকাণ্ডের দু'দিন পর অনেকের কানে এসেছে স্বাধীন বাংলা বেতারের কথা। শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে মেজর জিয়া নামে এক বাঙালি আর্মি অফিসার বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। একে অন্যকে বলাবলি করতে করতে কথাটা এখন প্রতিঘরেই ছড়িয়ে গেছে। সবাই এখন স্বাধীন বাংলা বেতার শোনার জন্য সকাল-সন্ধ্যা রেডিও'র নব্ ঘুরিয়েই চলেছে।

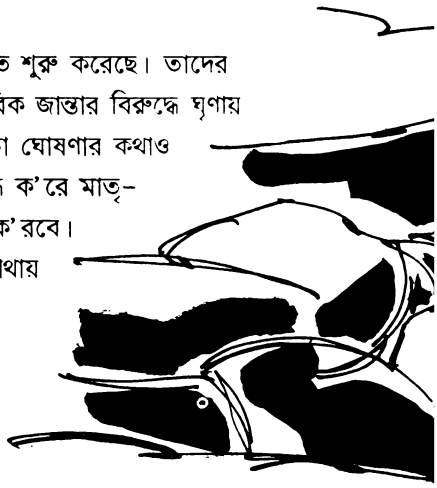

তরুণেরা ইতিমধ্যেই অন্য চিন্তা করতে শুরু করেছে। তাদের সমগ্র আত্মা বর্বর পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে ঘৃণায় রুখে উঠেছে। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার কথাও শুনেছে। তারা এখন যুদ্ধ করতে চায়। যুদ্ধ ক'রে মাতৃ-ভূমিকে ঐ নরপশুদের হাত থেকে উদ্ধার ক'রবে। কিন্তু কেমন ক'রে তারা যুদ্ধ করবে ? কোথায় ক'রবে যুদ্ধ ? অস্ত্র কই, ট্রেনিং কই ? কে তাদের অস্ত্র দেবে, ট্রেনিং দেবে ? তারা এখন প্রত্যেকে নিজের নিজের বন্ধুর সঙ্গে, ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে, চুপি চুপি আলোচনা করে--কি ক'রে যুদ্ধে যাওয়া যায় ? কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে, দেশের কোথাও কোথাও সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধ হচ্ছে। পুলিশ ও ইপিআরের যেসব লোক প্রাণে বেঁচে পালাতে পেরেছে, তারাই নাকি সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধ করছে, আর লোকজনকে সংগঠিত করছে। ঢাকার তরুণেরা এসব শুনছে, কিন্তু সেসব জায়গায় যাবার হদিস পাচ্ছে না। তারা 'যুদ্ধ' খুঁজছে,

যুদ্ধে যাবার রাস্তা খুঁজছে। একে অন্যকে জিজ্ঞেস করছে ভয়ে ভয়ে, সাবধানে। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর আপন ভাই, চাচা, মামা ছাড়া আর কাউকে জিজ্ঞেস করছে না। আর কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। এলিফ্যান্ট রোডের রুমী যুদ্ধ খুঁজছে, ধানমণ্ডির বাদল যুদ্ধ খুঁজছে, দিলু রোডের আলম, মণিপুরী পাড়ার বদি, হাটখোলার শাহাদত আর ফতে, অভয় দাস লেনের অ্যাসফী, কৈলাস ঘোষ লেনের কাজী, টিকাটুলির মায়া--সবাই নিজের নিজের বৃত্তে খুঁজে মরছে যুদ্ধে যাবার পথ।

মা এতসবের বিন্দু বিসর্গও টের পান নি। কোন বাড়ির মা-ই পান নি। ছেলেরা হ'ল মায়েদের কল্‌জের ধন, ছেলেরা জানে মায়েদের এসব কথা কখনই বলতে নেই, বললেই হুলস্থূল, কান্নাকাটি। মায়েরা কি প্রাণে ধরে ছেলেদের যুদ্ধে যেতে দিতে পারে ?

তবু ছেলেরা যুদ্ধে যায়। বেশির ভাগই মাকে লুকিয়ে, বিছানায় পাশ-বালিশ শুইয়ে, রাতের আঁধারে পালিয়ে চলে যায়। মায়ের কান্নাকাটির ভয়ে ব'লে যেতে পারে না। কিন্তু মনে মনে বিদায় চেয়ে নেয় মায়ের কাছ থেকে :

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।

এপ্রিলে রুমী মাকে বলে, 'জান আম্মা, সীমান্ত এলাকাগুলোতে যুদ্ধ হচ্ছে।'

মা চমকে যান, বিশ্বাস করেন না। রুমী জোর দিয়ে বলে, 'হচ্ছে। বহু জায়গায় বাঙালি আর্মি বিদ্রোহ করেছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ইপিআর, ইবিআর, পুলিশ, আনসারের লোকেরা। ঢাকা থেকে বহু ছেলে লুকিয়ে সীমান্তের দিকে চলে যাচ্ছে যুদ্ধ করবে বলে। পাক আর্মি যেসব গ্রাম, থানা, মহকুমা জ্বালিয়ে দিয়েছে, সেখানকার লোকেরাও সীমান্তের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে, যুদ্ধ করছে। আম্মা, আমি যুদ্ধে যেতে চাই।'

মা স্তব্ধ হয়ে যান। ভয়ে তাঁর বুক হিম। রুমী যুদ্ধে যেতে চায়! কি সর্বনেশে কথা! মাত্র বিশ বছর বয়স রুমীর, কেবল আই.এস.সি পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছে। এখন তো ওর পড়াশোনা করার কথা। যুদ্ধের ও কি বোঝে ?

কিন্তু রুমী নাছোড়বান্দা। তার অনেক বন্ধু বাবা-মাকে না বলে লুকিয়ে যুদ্ধে চলে গেছে, কিন্তু রুমী সে রকমভাবে যেতে চায় না। ছোটবেলা থেকে বাবা-মা তাকে শিখিয়েছেন--লুকিয়ে কিছু করবে না। যা মনেপ্রাণে করতে চাও, তা সামনাসামনি বলে করার মত সাহস যেন তোমার থাকে। তাই রুমী শেষ পর্যন্ত মায়ের মত আদায় করেই ছাড়ে।

মা মত দেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে হয়, তাঁর কল্‌জে ছিঁড়ে যাচ্ছে। কেউ যেন লোহার সাঁড়াশি দিয়ে তাঁর পাঁজর চেপে ধরেছে, তিনি নিশ্বাস নিতে পারছেন না।

রুমী চলে যায় মুক্তিযুদ্ধে। তার অনেক বন্ধুবান্ধব, চেনাজানা ছেলে আগেই গিয়েছে। আগরতলার দিকে সীমান্ত ঢাকা থেকে সবচেয়ে কাছে বলে ঢাকার প্রায় সব ছেলে এই রাস্তা দিয়েই সীমান্ত পার হয়। রুমীও তাই গিয়েছে। কিন্তু মা তো জানেন না, সে কোন পথ দিয়ে কেমন করে গিয়েছে, কোথায় গিয়েছে, কোথায় যুদ্ধ করছে। মা তাঁর নিজের কষ্ট ভোলার জন্যে বাড়িতে কাজের

পাহাড় জমিয়ে তোলেন। বেশি কাজের মধ্যে থাকলে দুঃখ কম লাগবে! মা মোয়া বানান, আচার বানান, বাগানে নিজের হাতে কাজ করেন, কাজের লোক থাকা সত্ত্বেও একগাদা কাপড় কাচতে বসেন। আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যান, তাদের খবরাখবর নেন।
এদিকে ঢাকায় ফুটফাট ছোটোখাটো গেরিলা তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে।

বিশ্বব্যাঙ্ক ও জাতিসংঘের ধারণা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানে ইয়াহিয়া সরকার যা করছে, তাকে কোনমতেই কিছুসংখ্যক বিচ্ছিন্নতাবাদী দেশদ্রোহীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া বলা চলে না। অতএব পাকিস্তানকে এবছর ব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য ঋণ দেওয়া যাবে

কি না, সে বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করতে ঢাকায় এসেছেন বিশ্বব্যাঙ্কের কয়েকজন প্রতিনিধি। আর জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন এসেছেন পূর্ব পাকিস্তানে আরো রিলিফ দেওয়া ও তার বন্টন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলাপ করতে। দেশে যে স্বাভাবিক অবস্থা নেই, দেশ যে এখন স্বাধীনতার যুদ্ধে জড়িত, তা ওঁদের বুঝিয়ে দেবার জন্য একদল গেরিলা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের গাড়ি-বারান্দায় রাখা গাড়ির ওপর তিনটে গ্রেনেড ছুঁড়ে দিয়ে গেল ১২ জুন।

জিন্না এভিনিউতে গ্যানিজ আর ভোগ্ বলে দুটো দোকানে কিছু মিলিটারি পুলিশ কেনাকাটা করছিল। গেরিলারা সেখানে গ্রেনেড ছুঁড়ে কয়েকজনকে মেরে দিয়ে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল। বিভিন্ন গেরিলা দল ঢাকায় আসছে, আলাদাভাবে নির্দেশমাফিক 'অ্যাকশান' করে আবার চলে যাচ্ছে। একদল ইচ্ছে করেই আরেক দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করে না। তবুও দেখা–সাক্ষাৎ হয়েই যায়, বন্ধুবান্ধব সব দলেই আছে। আর ঢাকা এত ছোট জায়গা।

জুলাইয়ের ১৯ তারিখে সন্ধ্যার পর আরো বড় ধরনের গেরিলা 'অ্যাকশান' হল ঢাকায়। একই সময়ে রামপুরার উলান, খিলগাঁওয়ের গুলবাগ আর শাহবাগের ধানমণ্ডি পাওয়ার সাব–স্টেশনে হামলা হল গেরিলাদের। বিদ্যুৎ চলে গিয়ে সারা শহর অন্ধকারে ডুবে গেল। মুদির দোকানে ভিড় জমে উঠল মোমবাতি কেনার জন্য।

মা এসব গেরিলা তৎপরতার খবর শোনেন আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবেন--এত ছেলে আসে ঢাকায়, তাঁর রুমী কি আসতে পারে না একবার ? কোন একটা অ্যাকশানে! অ্যাকশান শেষে, পাঁচ মিনিটের জন্যে হলেও তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাবে ? আহা, কতোদিন দেখেন নি ওই মুখ!

রুমীর বন্ধু মনু এসেছিল দেখা করতে, সে মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'আসবে খালাম্মা, আসবে। ওর ট্রেনিং হয়তো এখনো শেষ হয় নি। ও তো দেরিতে গেছে।'

তা বটে। রুমীর যাওয়াতে তিনিই তো বাদ সেধেছিলেন

প্রথমদিকে। মা এখন মুক্তিযোদ্ধা ছেলে পেলেই তাদের হাত দিয়ে টাকা পাঠান। মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার জন্যে অনেকেই টাকা দিতে চান। কিন্তু কোথায়, কাদের হাত দিয়ে পাঠাবেন, ভেবে পান না। আবার ভয়ও আছে, পাকিস্তানি কেউ বা রাজাকার, বিহারিদের কেউ জেনে গেলে মহাবিপদ। রুমীর বাবা শরীফের বন্ধু ও সহকর্মী মজিদ সাহেব দশ হাজার টাকা মুক্তিযুদ্ধের জন্য খরচ করবেন, স্থির করেছেন। তিনি শরীফকেই ভার দিয়েছেন এই টাকা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দিতে।

দেখতে দেখতে আগস্ট মাস এসে গেল। মায়ের মনের ভার যায় না কিছুতেই। আবার অন্য এক ধরনের স্বস্তিও আছে। ঢাকায় গেরিলা তৎপরতা ক্রমাগত বাড়ছে। রোজই হঠাৎ হঠাৎ গ্রেনেড ফাটার পিলে-চমকানো শব্দ শোনা যায়। বোঝা যায়, গেরিলা বিচ্ছুগুলো কোথাও হামলা করেছে। ঐ শব্দ শুনলে সবাই খুশি হয়, ঐ শব্দ শুনলে রাত্রে ভালো ঘুম হয়। কোনদিন ঐ শব্দ না শুনলেই বরং মনে আতঙ্ক জাগে, তবে কি--
না, ওরা ধরা পড়ে নি। দুপুরে বা সন্ধ্যায় যদিবা কোন কারণে বাদ যায়, তো মাঝরাতে হঠাৎ বু--ম্‌ম্‌ম্‌ করে বিরাট এক শব্দ চারদিক কাঁপিয়ে ঢাকাবাসীর উদ্বিগ্ন স্নায়ুতে আরামের স্নিগ্ধপ্রবাহ বইয়ে দেয়।

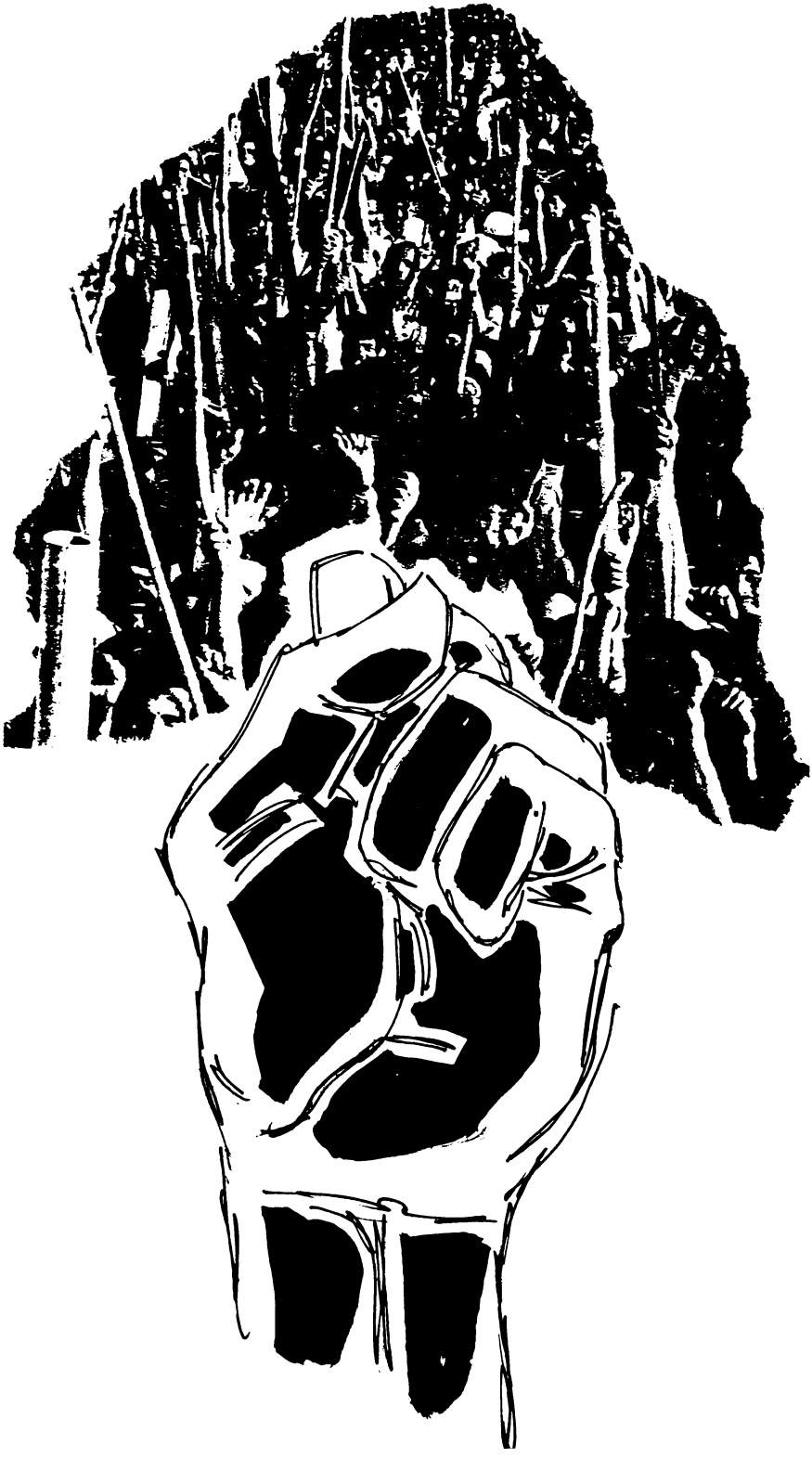

ঢাকায় বিচ্ছুদের কাজ-কারবার ক্রমেই দুঃসাহসিক হয়ে উঠছে। এইতো, ৩ আগস্ট সন্ধ্যার আগ দিয়ে স্টেট ব্যাঙ্কের গেটে, মিলিটারি-পুলিশের নাকের ডগায় পথচারীদের চোখের সামনে কয়েকজন বিচ্ছু বোমা ছুঁড়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। একটাকেও ধরতে পারে নি মিলিটারিরা। ছেলেগুলোর জানের ভয় বলে কিছু নেই। গ্রেনেডের মতই জানটাকেও হাতের মুঠোয় নিয়ে চলে ওরা। স্বাধীন বাংলা বেতারে মা শোনেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যারা যুদ্ধ করছে, তারাও এমনি অসম সাহসী। 'মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী'--জানের কোন পরোয়া নেই, জীবনমৃত্যু সত্যি সত্যিই পায়ের ভৃত্য।

স্বাধীনবাংলা বেতারে গান হচ্ছে :

তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে।
আমরা ক'জন নবীন মাঝি হাল ধরেছি শক্ত করে রে।
ঘর-বাড়ির ঠিকানা নাই
দিন রাত্রি জানা নাই
চলার ঠিকানা সঠিক নাই।
জানি শুধু চলতে হবে
এ তরী বাইতে হবে
আমি যে সাগর মাঝিরে।

ঘরবাড়ির ঠিকানাবিহীন, দিন-রাত্রির বোধবিহীন, অথই সাগরে দিক-চিহ্নহীন জানবাজ ঐ নবীন মাঝিদের কথা মনে করে মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন।

অবশেষে রুমী ঢাকায় এল ৮ আগস্ট সন্ধ্যাবেলা। এই দুই মাসেই তার চেহারা যেন বদলে গেছে। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল। কানের পাশে লম্বা জুলপি, মুখভর্তি ঘন দাড়ি, তামাটে গায়ের রঙ রোদে পুড়ে কালচে, দুই চোখে উজ্জ্বল ঝকমকে দৃষ্টি, গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে ফুটে রয়েছে সেই ভুবন-ভোলানো

হাসি। রুমীকে জড়িয়ে ধরে মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। বাবা আর ছোটভাই জামী ছলোছলো চোখে পাশে দাঁড়িয়ে রুমীর দিকেই তাকিয়ে থাকেন এক দৃষ্টিতে।

মা জানতে চান রুমী কোথায় ছিল, কেমন ছিল, কি খেত, কি করত। রুমী ছিল মেলাঘরে। মেলাঘর হল দুই নম্বর সেক্টরের হেডকোয়ার্টার্স। আগরতলা থেকে বেশ অনেকটা ভেতরে, না শহর, না গ্রাম এক পাহাড়ী জঙ্গুলে জায়গা। টিলার ওপর বেড়ার ঘরে, তাঁবুতে সবাই থাকে। সেক্টর টু-র কম্যাণ্ডার হলেন মেজর খালেদ মোশাররফ। তিনি ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ করে তাঁর সঙ্গের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সিলেটের তেলিয়াপাড়ায় চলে যান। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মেজর শাফায়াত জামিলও তাঁর সঙ্গী অফিসার ও সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহ করে তেলিয়াপাড়া চলে যান। সেখানে সেকেণ্ড ও ফোর্থ বেঙ্গলের বহু বাঙালি মিলিটারি অফিসার পালিয়ে গিয়ে জড়ো হন।

রুমী যখন যায়, জুন মাসের মাঝামাঝি, ততদিনে সীমান্তের সেক্টরগুলো মোটামুটি সংগঠিত হয়ে উঠেছে। মেজর খালেদ মোশাররফ তেলিয়াপাড়া থেকে সরে প্রথমে সীমান্তঘেঁষা শ্রীমন্তপুরে ক্যাম্প করেছিলেন। পরে সীমান্তে পাকিস্তানি সৈন্যদের হামলা বাড়ছে দেখে, তিনি তাঁর হেডকোয়ার্টার্স একটু দূরে ভেতরে মেলাঘরে নিয়ে যান।

রুমী মেলাঘরে গিয়ে দেখে, ঢাকার যত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা, ধানমণ্ডি-গুলশানের বড়লোক বাপের গাড়ি হাঁকানো ছেলেরা, খেলার মাঠের চৌকস ছেলেরা, ছাপোষা চাকুরে বাপের ছেলেরা--সবাই ওখানে জড়ো হয়েছে। সবাই যুদ্ধ করার জন্য গেছে। ওখানে গিয়ে রুমী তার আগের চেনা অনেক ছেলেকে দেখে--বাদল, আলম, স্বপন, বদি। ওখানে ক্যাপ্টেন হায়দার বলে একজন বাঙালি আর্মি অফিসার ছেলেদেরকে গেরিলা ট্রেনিং দেন। দেশের চারদিকের সীমান্ত ঘিরে যুদ্ধ চলছে, সীমান্তের ঠিক ওপাশেই ভারতের মাটিতে মুক্তিবাহিনীর সেক্টরগুলোর হেডকোয়ার্টার্স। বাংলাদেশ আর্মির পাশাপাশি রুমীরা আছে গেরিলা বাহিনীতে।

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতালও সেক্টর টু-তে আছে। প্রথম পর্যায়ে শ্রীমন্তপুরে এক বেডের হাসপাতালটির পত্তন করে যে আর্মির ডাক্তার, সেই ক্যাপ্টেন আখতার আহমদ এবং তার বউ খুকু রুমীর পূর্ব পরিচিত। হাসপাতাল এখন বিশ্রামগঞ্জ বলে একটা জায়গায়--বেশ বড় হয়েছে। সেখানে ডাঃ আখতার ছাড়াও আরো ডাক্তার এসে জড়ো হয়েছেন--ডাঃ জাফরুল্লাহ, ডাঃ মোবিন, ডাঃ নাজিম। বেগম সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে লুলু, টুলু, আখতারের বউ খুকু এবং আরো অনেক মেয়ে ঐ হাসপাতালে নার্সের কাজ করে।

এসব শুনে মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। রুমীর কপাল ভালো বলতে হবে। অচেনা জায়গায় গিয়ে ওর কয়েকজন প্রিয় পরিচিত মানুষ পেয়েছে।

রুমী যখন মেলাঘরে খাওয়ার কথা বলে, তখন মায়ের চোখে পানি ভরে আসে। খাওয়ার কষ্টটাই সবচেয়ে বেশি। তাও সবদিন ভাত-তরকারি জোটে না। কতোদিন গাছ থেকে কাঁঠাল পেড়ে, ক্ষেত থেকে তরমুজ, আনারস এসব তুলে খেয়ে থেকেছে ছেলেরা।

রুমী ঢাকায় এসেছে বটে কিন্তু মা তাকে বেশিক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন না। সে মাঝে মাঝে দু'একরাত বাসায় শোয়। আবার তিন-চার রাত নেই। মা বুঝতে পারেন, যে কাজ নিয়ে তারা এসেছে, সেই কাজেই রুমী ব্যস্ত। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেছেন, রুমী বলে নি। শুধু বলেছে, বেশি জানতে চেয়ো না, বলা নিষেধ। আবার মাঝে মাঝে নিজেই একটু আধটু আভাস দিয়েছে--কতো বিপজ্জনক তাদের কাজ-কারবার। যেমন, যে রাতে তারা কয়েকজন নৌকায় করে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের আশপাশটা রেকি করতে যায়, সে রাতে মিলিটারির হাতে প্রায় ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। মিলিটারিভর্তি নৌকার মুখোমুখি হয়েও বদির সাহস ও ক্ষিপ্রতার জন্য তারা বেঁচে যায়। বদি চোখের পলক ফেলার আগেই তার হাতে ধরা স্টেনগানের ব্রাশফায়ার করে ওদের ওপর। পুরো ম্যাগাজিন একেবারে খালি করে দেয়। মিলিটারিও গুলি চালিয়েছিল কিন্তু বদির ব্রাশের মুখে একদম সুবিধে করতে পারে নি। মিলিটারিদের কয়েকটা মরে, বাকিরা পানিতে

ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওদের নৌকা উল্টে যায়। অন্ধকার রাত ছিল বলেই রুমীরা নিরাপদে পালিয়ে আসতে পেরেছিল। শুনে মায়ের গা শিরশির করে। আরেকটু হলেই সবাই গুলি খেয়ে মরতে পারত, জখম হয়ে নদীর পানিতে তলিয়ে যেতে পারত। কোনদিন কেউ জানতেও পারত না, ছেলেগুলোর কি হলো।

রুমীকে সে কথা বলতে সে হাসে, 'আমাদের সেক্টর কম্যাণ্ডার খালেদ মোশাররফ কি বলেন জানো ? তিনি বলেন, কোন স্বাধীন দেশ জীবিত গেরিলা চায় না, চায় রক্তস্নাত শহীদ। অতএব মা-মণি, আমরা সবাই শহীদ হয়ে যাব, এই কথা ভেবে মনকে তৈরি ক'রেই এসেছি। তুমিও শক্ত হও।'

কি নিষ্ঠুর রুমী! এমন করে বলতে পারল ? মা শক্ত হবেন কি, তাঁর দুই চোখ পানিতে ভরে ওঠে, বুকের ভেতরে তীব্র যন্ত্রণা হয়। সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন ওড়াবার দায়িত্ব নিয়ে রুমীদের দলটা ঢাকা এসেছে। কিন্তু এসে দেখে যে পাওয়ার স্টেশন একেবারে দুর্ভেদ্য দুর্গ। আগের চেয়ে অনেক বেশি মিলিটারি পাহারা। উলান, গুলবাগ, ধানমণ্ডি পাওয়ার সাব-স্টেশনের অ্যাকশানের পর থেকে পাকিস্তান সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ দারুণ সতর্ক হয়ে গেছে। ইন্টারকন, ফার্মগেট অ্যাকশানের পর সামরিক জান্তা একেবারে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে রয়েছে। বস্তুত সারা শহরেই এখন নিরাপত্তার ভয়ানক রকম কড়াকড়ি। মাঝে মাঝে রুমী বাসায় তিন-চারজন সহযোদ্ধা বন্ধু নিয়ে আসে খাওয়ার জন্য। কখন আসে, তার তো ঠিক-ঠিকানা নেই, তাই মা সবসময় বেশি বেশি খাবার রান্না ক'রে ফ্রিজে রেখে দেন, যাতে যখনই ওরা আসে, তাড়াতাড়ি গরম করে টেবিলে দিতে পারেন। ওরা খেতে এলে মায়ের খুব ভাল লাগে। মেলাঘরে খাওয়ার কতো কষ্ট, যে ক'টা দিন পারেন, একটু ভালো-মন্দ খাইয়ে দিতে চান। কিন্তু ওদের কি কিছুর ঠিক-ঠিকানা আছে ? এই তো ২৫ আগস্টের সন্ধ্যায় রুমী মাকে বলল, ২৮ নম্বর রোডে একটু নামিয়ে দিতে। আধঘন্টার মধ্যে ফিরে আসবে। মা খুশি মনে ভাবলেন, তার মানে বাসাতেই খাবে। রুমীকে ২৮ নম্বর রোডের এক বাড়িতে, যেখানে ওদের একটা গোপন আস্তানা আছে,

সেখানে নামিয়ে দিয়ে এসে নানারকম খাবারের ব্যবস্থা করছেন; আধঘন্টাও কাটে নি, রুমী দুই বন্ধু নিয়ে ফিরে এল। ওদের চোখমুখ উত্তেজনায় লাল। কি ব্যাপার ? না ওরা ছয়জন গেরিলা ১৮ নম্বর রোডে এইমাত্র একটা 'অ্যাকশান' ক'রে এল। সাত-আটটা খানসেনা মরেছে।

মায়ের তো মুখ হাঁ। বাবারও। জামীরও। ওরা ফেরার সময় প্রায় ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। চার নম্বর রোডে একটা মিলিটারি জীপ ওদের পিছু নিয়েছিল, রুমী দেখতে পেয়ে স্টেনের বাঁট দিয়ে গাড়ির পেছনের কাচ ভেঙে ব্রাশফায়ার করে। জীপের ডাইভার প্রথম চোটেই মরে, ফলে জীপটা উল্টে যেতে ওরা রেহাই পায়। অন্য যে দুটো গাড়ি ওদের অনুসরণ করে, তাদের চোখে ধুলো দিয়ে ওরা পালিয়ে আসতে পেরেছে।

তো, এইরকম সব দুর্দান্ত 'অ্যাকশান' করে এই বিচ্ছুগুলো। বিষম সাহসী এরা সবাই, নিখুঁত এদের রিফ্লেক্স, অপূর্ব এদের টিমওয়াক।

এ ছাড়াও, ঢাকায় বিচ্ছুরা ক্রমাগত ছোটোখাটো তৎপরতা চালিয়েই যাচ্ছে। এর কোন ধারাবাহিকতা বা পূর্ব নির্ধারিত প্ল্যান থাকে না। যে যার সুবিধে মতো চলতে ফিরতে করে যাচ্ছে। নানারকম জিনিস দিয়ে এগুলো করা হয়। সবচেয়ে উপযোগী যেটা, সেটার নাম অ্যান্টি-পার্সোনাল মাইন। খুব ছোট্ট সাইজের বিস্ফোরক, প্যান্টের পকেটে বা গাড়ির ভেতরে সহজেই লুকিয়ে রাখা যায়। এগুলো বিচ্ছুরা সুযোগ-সুবিধে মতো গাড়ির চাকার নিচে বসিয়ে দেয়। যে রাস্তা দিয়ে মিলিটারি ট্রাকের বহর যাবে, আগে থেকে জানতে পারলে, সেই রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে আসে। জীপ বা ট্রাকের চাকা মাইনের ওপর পড়লেই বিকট আওয়াজে চাকা ফাটে। বেশির ভাগ সময় গাড়ি উল্টে যায়। এতে ক্ষতি হয়তো খুব বেশি একটা হয় না, কিন্তু খানসেনাদের মানসিক শান্তি নষ্ট হয়। তাছাড়া রাতের বেলা

হঠাৎ হঠাৎ গ্রেনেড ফাটানো তো আছেই। খানসেনারা সে শব্দে ভয়ানক ভয় পায়। ভাবে কতো বিচ্ছু না-জানি ঢাকা শহর সয়লাব করে ফেলেছে। খালেদ মোশাররফ এগুলোকেই সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধকলা বলেন। এর দ্বারা খানসেনাদের দিনের আরাম, রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়। আর সেটা করাই হল বিচ্ছুদের আসল উদ্দেশ্য।

২৯ আগস্টের রাত বারোটা। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে ছিল, কখন যে মিলিটারি-পুলিশ বাড়ির চারদিক ঘিরে ফেলেছে, কেউ টের পায় নি। গেটে ওদের ধমাধম বাড়ি মারার শব্দে সবাই জেগে দেখে মহা সর্বনাশ। কোন দিক দিয়েও এতটুকু ফাঁক নেই যে, রুমী লুকিয়ে পালাতে পারে।খানসেনারা শুধু মা আর রুমীর বুড়ো, অন্ধ দাদাকে রেখে বাড়ির অন্য সব পুরুষকে ধরে নিয়ে গেল।

মা'র মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। ভোর না হওয়া পর্যন্ত তিনি পুরো বাড়ির সবক'টা বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে একা একা পায়চারী করে কাটালেন। সকাল হলে খবর পেয়ে আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব অনেকেই এলেন। শরীফের দুই সহকর্মী মঞ্জুর আর মিকির সঙ্গে মা এখানে-ওখানে অনেক ছোটাছুটি করলেন, সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের যে অফিস আছে এম.পি.এ হোস্টেল বিল্ডিং-এ, সেখানে গেলেন, কিন্তু কোন ফল হল না। দু'দিন পর ৩১ আগস্ট।

দুপুর আড়াইটের সময় হঠাৎ শরীফ, জামী, মাসুম এসে হাজির। মা দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললেন। ওদের দিকে একনজর তাকিয়েই আর্তস্বরে বললেন, 'রুমীকে ছাড়ে নি ?'

রুমীকে তারা ছাড়ে নি। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের নির্ভুল খবর

জানা ছিল কারা ঢাকায় অ্যাকশানগুলো করে। তারা অনেকদিন ধরে ওঁৎ পেতে ছিল, ২৯ তারিখ দুপুরবেলা বেইমান বাঙালি রাজাকারের কাছ থেকে খবর পেয়ে প্রথমে দুই জায়গা থেকে দুইজন গেরিলাকে ধরে। তারপর তাদের নির্যাতন করে তাদের সঙ্গী অন্য গেরিলাদের খবর বের করে। রাত বারোটায় একই সময়ে মিলিটারি-পুলিশের অনেকগুলো দল হানা দেয় রুমীর বাড়ি, চুল্লুর বাড়ি, আলমের বাড়ি, আজাদের বাড়ি, আলতাফ মাহমুদের বাড়ি, স্বপনের বাড়ি, অ্যাসফীর বাড়ি, শাহাদতের বাড়ি। সব বাড়ি থেকেই, পুরুষমানুষ যে কয়জন পেয়েছে, সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে। কপাল ভালো, শাহাদত, ফতে, আলম, উলফাত তাদের বাড়িতে ছিল না, কেবল তারাই বেঁচে গেছে। স্বপনকে তার মা পালাতে সাহায্য করেন, সে বেঁচে গেছে, কিন্তু তার বাবা আর মামাকে ধরে নিয়ে গেছে। খানসেনারা দুই-তিনদিন সবাইকে অমানুষিক নির্যাতন করে কেবল আসল বিচ্ছুগুলোকে রেখে বাদবাকি আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু কি তাদের অবস্থা! মারের চোটে বেশির ভাগেরই পিঠের শিরদাঁড়ায় ব্যথা, কারো হাত-পায়ের আঙুল ভেঙেছে, কারো কানের পর্দা ফেটেছে, কারো পিঠে বেতের লাল লাল দাগ। কেউ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আর যাদেরকে ছাড়ে নি, সেই রুমী, বদি, জুয়েল, আজাদ, আলতাফ মাহমুদ, হাফিজ, বাশার— তাদের কোন খোঁজই বের করা গেল না। মা, বাবা কতো জায়গায় দৌড়োদৌড়ি করেন, পীর-ফকিরের কাছে যান। বাবার বন্ধুরা তাঁদের নিজের নিজের চেনা পাক আর্মি অফিসারদের ধ'রে খবর জানার চেষ্টা করেন, কিন্তু কেউ কোন খবর বলতে পারে না। মা'র জীবনটা উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। বাসায় কাজের লোক নেই, রান্না-খাওয়া বন্ধ হতে পারে না, তাই তিনি যন্ত্রচালিতের মতো রান্নাবান্না করেন। বাড়িতে স্রোতের মতো আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আসেন, মা তাঁদের আপ্যায়ন করেন। পীর সাহেবদের আস্তানাতেও ধরনা দেন প্রতিদিন। সেখানে দেখা হয় আরো বহু ছেলেহারা মা, স্বামীহারা বউদের সঙ্গে।

এসবেরই ফাঁকে ফাঁকে মা সর্বক্ষণ ভাবেন রুমীর কথা।

রুমী এইতো সেদিন জন্মাল। ১৯৫১ সালের ২৯ মার্চ। ছোট্ট বাচ্চাটি, কতো অসহায়, মায়ের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। সেই ছেলে ক্রমে বড় হয়ে এক ব্যক্তিত্বময়, স্বাধীনচেতা তরুণ যুবকে পরিণত হল! তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, চিন্তাভাবনা গড়ে উঠল। অসাধারণ মেধাবী ছেলে রুমী। স্কুলের বই ছাড়াও, কতো যে বাইরের বই পড়ত সে, তার মধ্যে বিশেষ করে রুশ বিপ্লবের কাহিনী, চীন বিপ্লবের কাহিনী, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কীয় যেকোন বই তার

প্রিয় ছিল। ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, প্রীতিলতা, সুভাষ বোস তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিল। বিদেশের ইয়াসির আরাফাত আর চে গুয়েভারা তার মনের মানুষ ছিল। একবার তো রুমী খেপেছিল প্যালেস্টিনিয়ান লিবারেশন আর্মিতে যোগ দেবে বলে। ক্ষুদিরামের ফাঁসির গানটার সুরে সে প্রায় প্রায়ই শিস দিত--একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। এইতো, ২৯ আগস্টের রাতে, শোবার সময় রুমী বলল, 'আম্মা, মাথাটা কেন জানি দপ্‌দপ্‌ করছে। ভালো করে বিলি দিয়ে দাও তো।' মা রুমীর মাথার কাছে বসে তার চুলে বিলি কাটতে লাগলেন, সাইড-টেবিলে রেডিওটা খোলা ছিল, একের পর এক বাংলা গান হচ্ছিল—খুব সম্ভব কলকাতা স্টেশন। হঠাৎ কানে এল ক্ষুদিরামের ফাঁসির সেই বিখ্যাত গানের কয়েকটা কলি :

একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি
ওমা, হাসি হাসি পরব ফাঁসি
দেখবে জগৎবাসী—

রুমী বলল, 'কি আশ্চর্য আম্মা। আজকেই দুপুরে এই গানটা শুনেছি। রেডিওতেই—কোন স্টেশন থেকে জানি না। আবার এখনও—একই দিনে দু'বার গানটা শুনলাম। না জানি কপালে কি আছে!' এসব কথা ভাবলে মা মাঝে মাঝে কেমন যেন হয়ে যান। কাঁদতে কাঁদতে ফিটের মতো হয়। তারপর আবার মনে জোর এনে উঠে দাঁড়ান, সংসারের যাবতীয় কাজকর্মের দিকে মনোযোগ দেন।

২৯ আগস্ট রাতে এতগুলো গেরিলা একসঙ্গে ধরা পড়ার পর কিছুদিন ঢাকা শহর যেন মূর্ছিতের মতো পড়ে ছিল। কিন্তু সে মাত্র কয়েকদিনের জন্য। শবেবরাতের রাত্রে মা আবার শুনতে পেলেন সেই আকাঙ্ক্ষিত শব্দ বু-ম্‌ম্‌ম্‌!

মেলাঘর থেকে নতুন গেরিলা দল এসে ঢাকার উপকণ্ঠে সাভারের এক গ্রামে ঘাঁটি গেড়েছে। কয়েকদিন পর মেলাঘর থেকে অন্য আরেকটা দল এসে গোপীবাগের পেছনদিকের একটা গ্রামে ঘাঁটি গাড়ল। তার মানে ঢাকা শহরের দুই বিপরীত প্রান্তের দু'টি গ্রামে অনেক বিচ্ছু এসে গেছে। মেলাঘর থেকে ক্যাপ্টেন হায়দার অনেক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এদেরকে পাঠিয়েছেন। এরা বিভিন্ন

কৌশলে অল্প অল্প করে অস্ত্র নিয়ে ঢাকায় ঢুকবে আর ঢাকা শহর তছ্‌নছ্‌ করবে।

এসব তথ্য মা অনেক পরে জেনেছেন। কিন্তু তথ্য জানার আগেই মা এবং সেই সঙ্গে ঢাকার সবাই বিচ্ছুদের উপস্থিতি টের পেতে শুরু করেছেন প্রতিদিনের ছোটোবড় নানারকম অ্যাকশানে।

১৪ অক্টোবর ঢাকা শহরে মহা হৈচৈ পড়ে গেল। আগের রাত্রে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা বনানীতে মোনেম খানের বাড়িতে ঢুকে তাকে গুলি করে মেরেছে। ২০ অক্টোবর বুধবার দুপুর একটায় বিচ্ছুরা স্টেট ব্যাঙ্কের ছয়তলায় একটা বাথরুমে বোমা ফাটিয়ে দু'জন পাকিস্তানি কম্যাণ্ডো মেরেছে। তার আগের দিন মঙ্গলবার সকালের দিকে মতিঝিলে প্রুডেন্সিয়াল ইপিআইডিসি আর হাবীব ব্যাঙ্কের তিনটে বিল্ডিংয়ের সামনের রাস্তায় বিচ্ছুরা বোমা ফাটিয়েছে, ওখানে রাস্তায় ছয়টা গাড়ি নষ্ট হয়েছে, তিনটে বিল্ডিংয়ের সামনের দিকে সব জানালার কাচ ভেঙেছে! তারও দু'দিন আগে ১৮ তারিখে মোহাম্মদপুরে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলে বোমা ফেটেছে।

২৮ অক্টোবর ডিআইটি ভবনের একেবারে সাততলায় বোমা ফাটলো। টাওয়ারের একদিকে মস্ত একটা গর্ত হয়ে গেছে। ঐ বিল্ডিংয়েই টেলিভিশন স্টেশন, সেখানে নিরাপত্তার মহা কড়াকড়ি। সদর ফটকে মিলিটারি পুলিশ তো আছেই, প্রতি তলায় ওঠার সিঁড়ির মুখেও পাহারা। এতসব ফাঁকি দিয়ে বিচ্ছুরা কি করে যে একেবারে সাততলায় গিয়ে বোমা ফাটালো, সে একটা রহস্য বটে!

এইসব খবর যত মায়ের কানে আসে, তত তাঁর মনের ভেতর থেকে কষ্ট, হতাশা, রাগ উবে যায়। ২৯ আগস্টের গ্রেপ্তারের পর মাত্র কয়েকটা দিন ঢাকা শহর নিথর ছিল। তারপরই আবার বিচ্ছুরা কিলবিল করতে শুরু করেছে।

৩১ অক্টোবর হঠাৎ একটা মর্মান্তিক দুঃসংবাদ মায়ের কানে আসে। খালেদ মোশাররফ নাকি যুদ্ধে মারা গেছেন। খবর শুনে বাবা-মা দু'জনেই ভীষণ ভেঙে পড়েন। রুমীদের গ্রেপ্তারের ধাক্কা একটু একটু করে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন, ঢাকার বুকে গেরিলাদের বিভিন্ন তৎপরতায় মনের মধ্যে একটু একটু করে আশার সঞ্চার হচ্ছে; এর মধ্যেই আবার একি বিনা মেঘে বজ্রপাত!

খালেদের মৃত্যু মানেই সেক্টর টু-র গেরিলা বাহিনীর মাথার ওপর থেকে চাল উড়ে যাওয়া। খালেদ মোশাররফের পরিশ্রম আর চেষ্টার ফলেই দুই নম্বর সেক্টরে নিয়মিত সেনাবাহিনীর পাশাপাশি গ'ড়ে উঠেছে বিরাট গেরিলা বাহিনী। দেশের অন্যসব জায়গা থেকে তো বটেই, বিশেষ করে ঢাকার যত শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, টগবগে, বেপরোয়া ছেলে সবাই এসে জড়ো হয়েছে এই সেক্টর টু-তে। খালেদ মোশাররফ কেবল তাদের সেক্টর কম্যাণ্ডারই নন, খালেদ মোশাররফ তাদের হিরো। যতগুলো ছেলে সেক্টরে রাখার অনুমতি ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছেলেকে আশ্রয় দিতেন খালেদ। নির্দিষ্টসংখ্যক ছেলের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ রেশন দুইগুণ বেশি ছেলেরা ভাগ করে খেত। খালেদ বলতেন, 'ঢাকায় গেরিলা তৎপরতা অব্যাহত রাখার জন্য আমার প্রচুর ছেলে দরকার। অথচ আওয়ামী লীগের ক্লিয়ারেন্স, ইউথ ক্যাম্পের সার্টিফিকেট বা ভারত সরকারের অনুমোদন পেরিয়ে যে কয়টা ছেলে আমাকে দেওয়া হয়, তা যথেষ্ট

নয়।' তাই খালেদ বাদলকে বলতেন, 'যতো পার, সরাসরি ছেলে রিক্রুট করে সোজা আমার কাছে নিয়ে আসবে। এই যুদ্ধ আমাদের জাতীয় যুদ্ধ। দলমত নির্বিশেষে যারাই দেশের জন্য যুদ্ধ করতে আসবে, তাদের সবাইকে আমি সমানভাবে গ্রহণ করব।'

বাদল তাই করত। বাদল আর তার দুই বন্ধু সেই ২৭ মার্চেই ঢাকা ছাড়ে। তারা প্রথম থেকেই খালেদ মোশাররফের সঙ্গে। খালেদের পরামর্শ এবং প্রেরণাতেই বাদল বারে বারে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঢাকা এসেছে।

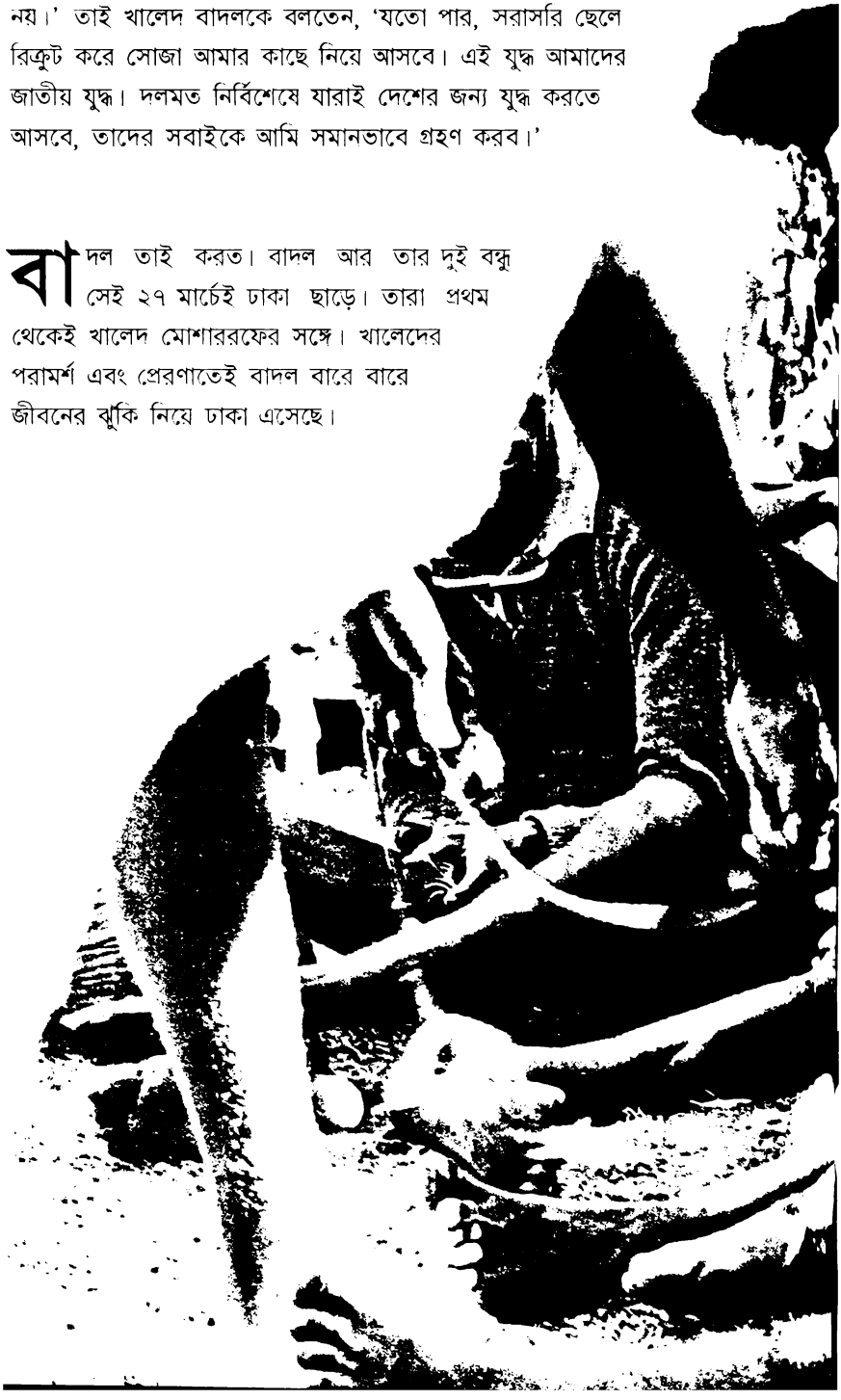

ঢাকার তরুণদের সংগঠিত করেছে। তার সহায়তায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন সময়ে একে একে ওপারে গেছে শাহাদত চৌধুরী, ক্যাপ্টেন আকবর, ক্যাপ্টেন মালেক, ক্যাপ্টেন আলমগীর সাত্তার, কাজী, মায়া, ফতে, দুলু, গাজী, জিয়া, আনু এবং আরো বহু শত ছেলে। সেক্টর টু-র খাতায় যতো ছেলের নাম থাকতো, তার চেয়ে অনেক বেশি ছেলেকে খালেদ ক্যাম্পে রেখে গেরিলা ট্রেনিং দিতেন, ঢাকা পাঠাবার জন্য তৈরি করতেন। তিনশ' ছেলের রেশন ছ'শ' ছেলে ভাগ করে খেত। খালেদ এভাবে গেরিলা বাহিনী তৈরি না করলে ঢাকার গেরিলা তৎপরতায় এত সাফল্য আসত কি না, সন্দেহ। ২৯ আগস্ট এতগুলো গেরিলা ধরা পড়ার পরও, মাত্র দেড়-দুই সপ্তাহের মধ্যেই অজস্র, প্রচুর গেরিলা ঢাকার বিভিন্ন দিক দিয়ে শহরে ঢুকছে, অ্যাকশান করছে, পাক আর্মিকে নাস্তানাবুদ করছে, সামরিক সরকারের ভিত্তি নড়িয়ে দিচ্ছে, অবরুদ্ধ দেশবাসীর মনোবল বাড়িয়ে

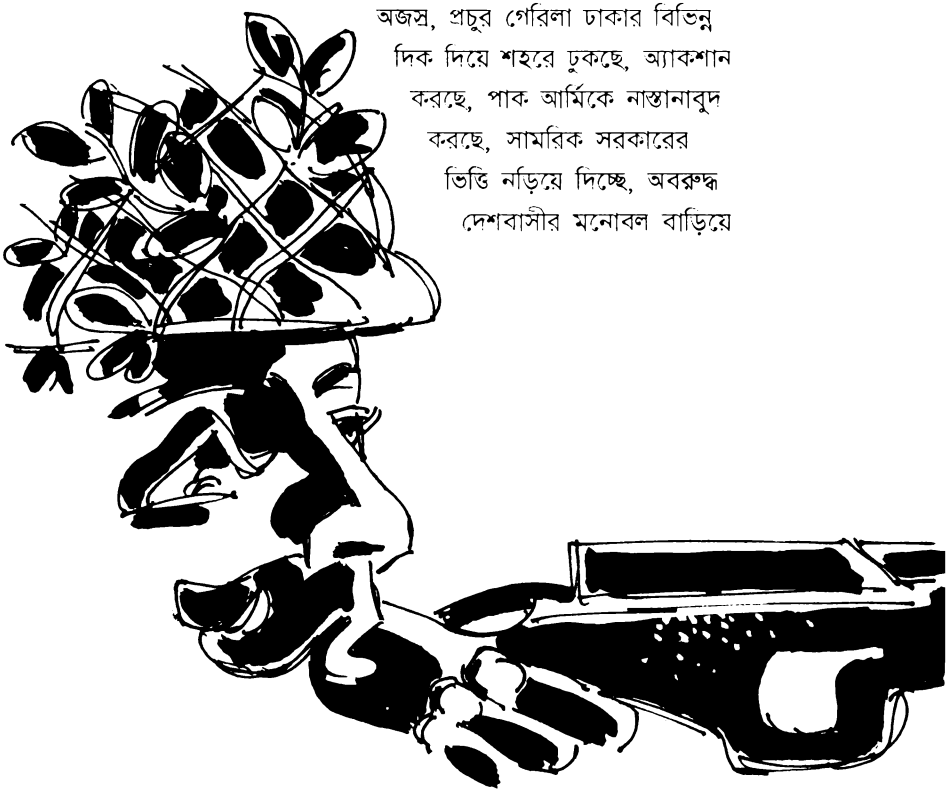

দিচ্ছে, এটাও সম্ভব হচ্ছে খালেদেরই দূরদর্শিতার জন্য।
সেই খালেদ মোশাররফ যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয়েছে ? খালেদের মৃত্যুসংবাদে মা'র মনের মধ্যে রুমীর শোক দ্বিগুণ উথলে ওঠে। দূরে একটা গ্রেনেড ফাটলো। কোন এক রুমী, এক বদি, এক জুয়েল এই রৌদ্র ঝলমল বিকেলে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে কোথাও আঘাত হানল। স্বাধীনতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে খালেদ মোশাররফের হাতে গড়া গেরিলারা।
খালেদ নেই, রুমী নেই, জুয়েল নেই, কিন্তু যুদ্ধ আছে, স্বাধীনতার যুদ্ধ। ক'টা দিন মা'র খুব অসহ্যে কাটল। কিন্তু সব দুঃখের শেষে একটুখানি স্বস্তি আছে। ৪ নভেম্বর একটা সুখবর পাওয়া গেল—খালেদ মারা যান নি, যুদ্ধে সাংঘাতিক জখম হয়েছেন। কিন্তু বেঁচে আছেন।
মা দুই হাত ওপরে তুলে শোকর গোজারি করেন : খোদা, তুমি অপার করুণাময়।
দিন কেটে যাচ্ছে। ঢাকা শহরে গেরিলা অ্যাকশান ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন সরকারি অফিসে, স্কুলে বোমা বিস্ফোরণ, প্রকাশ্য দিবালোকে ব্যাঙ্ক লুট—খানসেনারা পাগলের মতো হয়ে উঠেছে। তাদেরকে 'মুকুত'-এর ভূতে ধরেছে। সন্ধ্যার পর তারা তাদের ছাউনি থেকে ভয়ে বেরোয় না। পূর্ব বাংলার চারধারে সবগুলো সীমান্তেও যুদ্ধ খুব প্রচণ্ডভাবে চলছে। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের চাপ যতই বাড়ছে, পাকিস্তান সরকার ততই এটাকে ভারতীয় হামলা বলে খবর কাগজে জোর প্রচার চালাচ্ছে।

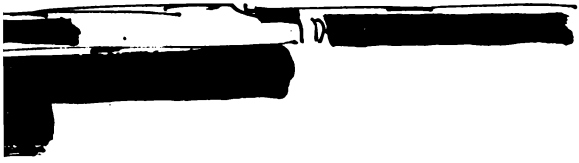

ঢাকা শহরেও কেমন একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব এসে গেছে। ৫ নভেম্বর হঠাৎ সরকারি আদেশে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে রাতে নিষ্প্রদীপের মহড়া হল একঘন্টার জন্য। ক'দিন পরে কাগজে দেখা গেল—সরকারি,

বেসরকারি সব বাড়িঘরের পাশে ট্রেঞ্চ খোঁড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঈদের আর বেশি দেরি নেই। একদিকে বিহারি ও রাজাকারদের মধ্যে কেনাকাটার ধুম পড়েছে, অন্যদিকে বিচ্ছুরা নিউ মার্কেট, বায়তুল মোকাররমে শাড়ি-গহনার দোকানে বোমা ফাটাচ্ছে।

মা'র কিচ্ছু ভালো লাগে না। বিচ্ছুদের উৎপাতে পাক সরকার খ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে উঠেছে। সব রাগ এসে পড়েছে অবরুদ্ধ নগরবাসীর ওপর। যেভাবে পারছে, তাদের নাজেহাল

করছে। অপমান করছে। ২৭ রমজান শবে কদরের রাতে মোমিন মুসলমানরা ঠিকমত আল্লার ইবাদতও করতে পারে নি। ও রাতে কারফিউ ছিল না, শবে কদর বলেই। মুসল্লিরা সারারাত মসজিদে ইবাদত-বন্দেগি ক'রে ফজরের নামাজ প'ড়ে তারপর বাড়ি ফিরবেন। কিন্তু সরকার হঠাৎ ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে কারফিউ জারি করে দিল। ফজরের আজান পড়বে পৌনে ছ'টায়। মুসল্লিরা সবাই হুড়মুড়িয়ে বাড়ির পানে দৌড় দিয়েছেন। ফজর নামাজ পর্যন্ত থাকার উপায় কই ? তাহলে তো মসজিদেই আটকা পড়ে থাকতে হবে। তাই শরীফ আর জামীও বাড়ি ফিরে এসেছে। শবে কদর বলে আজ অফিসও ছুটি। কাল সারারাত জেগে সবাই নামাজ পড়েছেন, আজ দিনে একটু ঘুমোবেন। কিন্তু সে সুযোগও কেউ পেলেন না। ন'টার দিকে মাইকে ঘোষণা শোনা গেল, যার যার বন্দুক, পিস্তল আছে, লাইসেন্সসহ নিয়ে মেইন রোডে আসুন। অতএব সবাই আবার ছুটল বড় রাস্তায়, যার যার বন্দুক-পিস্তল ঘাড়ে ক'রে।

শরীফ, জামীও তাদের দুটো বন্দুক, একটা পিস্তল আর লাইসেন্সগুলো নিয়ে এলিফ্যান্ট রোডে গেল। দেখে সারা পাড়ার লোক অস্ত্র হাতে বড় রাস্তাজুড়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারফিউ বলে রাস্তা ফাঁকা--তাই রাস্তাজুড়ে সবাই দাঁড়িয়েছে। রাস্তার মাঝখানে খানসেনারা টেবিল-চেয়ার পেতে সবার কাছ থেকে বন্দুক-পিস্তল-লাইসেন্স সব জমা নিয়ে প্রত্যেককে আবার রসিদ লিখে দিল। এইসব শেষ হতে বিকেল চারটে বাজল। শরীফ যখন ফিরল, তার সারামুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দুই চোখ লাল। গতকাল সারারাত মসজিদে জাগা, আজ সারাদিন গোসল, বিশ্রাম কিছু নেই, অস্ত্র হাতে সারাদিন রোদে দাঁড়িয়ে থাকা। শীতের রোদ হলেও রোজা রেখে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকা খুবই কষ্টকর। জামীর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তার জ্বর এসেছে। রুমীর জন্যে মাঝে মাঝে মা'র মনে এমন হাহাকার জাগে যে, তখন আর কিছু ভাল লাগে না তাঁর। রুমীকে আর কি কখনো দেখবেন তিনি ? রুমীর একটা ফটো বের করে একটা স্ট্যাণ্ডে লাগিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন সেটার দিকে। কতোদিন

দেখেন নি ওই প্রিয় মুখ। এই কি ছিল বিধিলিপি ? রুমী কি কেবলি ছবি হয়ে রইবে তাঁর জীবনে ? আর কি ফিরে পাবেন না তাকে ? রুমী যে সবসময় জীবনানন্দ দাশের কবিতা আবৃত্তি করত :

আবার আসিব ফিরে, ধানসিঁড়ি নদীটির তীরে --এই বাংলায়
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে।

রুমী, তোমাকে আসতেই হবে আবার ফিরে।

মা চোখ মুছে ছবিটার নিচে এক টুকরো কাগজে বড় বড় অক্ষরে লিখলেন : আবার আসিব ফিরে--এই বাংলায়। ফটোটা রাখলেন নিচতলায় বসার ঘরের কোণার টেবিলে। আগামীকাল ঈদ। অনেক মানুষ আসবে ঈদ মিলতে। তারা সবাই এসে দেখবে রুমী কেমন কোমরে হাত দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সদর্পে ঘোষণা করছে--আবার আসিব ফিরে, এই বাংলায়।

ঈদের দিনে রুমীদের বাড়িতে কোন আয়োজন নেই। কারো জামাকাপড় কেনা হয় নি। দরজা-জানালার পর্দা কাচা হয় নি, ঘরের ঝুল ঝাড়া হয় নি। বসার ঘরে টেবিলে রাখা হয় নি আতরদানি। শরীফ, জামী ঈদের নামাজও পড়তে যায় নি। কিন্তু মা ভোরে উঠে ঈদের সেমাই, জর্দা রেঁধেছেন। যদি রুমীর সহযোদ্ধা কেউ আজ আসে এ বাড়িতে ? বাবা-মা-ভাই-বোন-পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন কোন গেরিলা যদি রাতের অন্ধকারে আসে এ বাড়িতে ? তাদেরকে খাওয়ানোর জন্যে মা রেঁধেছেন পোলাও, কোর্মা, কোপ্তা, কাবাব। তারা কেউ এলে মা চুপি চুপি নিজের হাতে বেড়ে খাওয়াবেন। তাদের জামায় লাগিয়ে দেবার জন্যে এক শিশি আতরও তিনি কিনে লুকিয়ে রেখেছেন।

ঘটনা একটু দ্রুতই ঘটছে কিছুদিন থেকে। ২৩ নভেম্বর হঠাৎ খবর কাগজে বড় বড় শিরোনামে দেখা গেল : ভারতের সর্বাত্মক আক্রমণ।

পাকিস্তানি সামরিক জান্তা মুক্তি বাহিনীর ঠেলা সামলাতে না পেরে এখন সব দোষ ভারতের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে।

মার কিছু ভাল লাগে না। এখন আর খবর কাগজে চোখ বোলাতেও ইচ্ছে করে না। কতো আর এক তরফা মিথ্যে কথা পড়া যায় ? স্বাধীনবাংলা বেতারের অনুষ্ঠান ছাড়া রেডিও শোনেনই না। ২৯ আগস্টের পর থেকে টিভি খুলতে দেন নি কাউকে। এখন মা খালি বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করেন। জিন্না এভিনিউ, বায়তুল মোকার্‌রমে ফুটপাতে চাদর বিছিয়ে বহু ছোট দোকানী গরম কাপড়-চোপড় নিয়ে বসে। সেখানে গিয়ে খুঁজে খুঁজে মা সোয়েটার কেনেন, মাফলার কেনেন, মোজা কেনেন। আগে শুধু ওষুধ আর সিগারেট কিনতেন। টাকার সঙ্গে ওগুলোই পাঠাতেন। এখন শীত এসে গেছে। গরম কাপড় দরকার। বাবা বলেছেন খুব ছোট ছোট প্যাকেট করতে। যাতে ছেলেদের নিতে সুবিধে হয়। যাতে কেউ সন্দেহ না করে। তাই মা খুব ছোট ছোট প্যাকেট করেন—একটা সোয়েটার, একটা মাফলার, একজোড়া মোজা। অবশ্য মোজা যে খুব কাজে লাগে তা নয়। বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধার জুতোই নেই।

রুমী, আলম, কাজীদের মুখে শুনেছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে বেশির ভাগ ছেলে লুঙ্গি, গেঞ্জি পরে যুদ্ধ করে। খালি পায়ে কাদাপানি পার হয়ে যায়। ভাঙা চাড়ায়, কাচে পা কেটে যায়। উরুতে, কোমরে জোঁক কামড়ে ধরে। তবু মা মোজাও কেনেন। মোজা পাঠান। অন্তত নিজেকে তো ভোলানো যায়-- তাঁর ছেলেরা এই শীতে জুতো-মোজা পরে যুদ্ধ করছে।

কবে যুদ্ধ শেষ হবে ? মার যে আর সহ্য হয় না। আগস্ট মাসে রুমী আসার পর জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওরে, আর কতদিন এমন চলবে ?

রুমী হেসে বলেছিল, 'কি যে বলো আম্মা, যুদ্ধতো কেবল শুরু। জানো না, ভিয়েতনামে কতো বছর ধরে যুদ্ধ চলেছিল ?'

মা শিউরে উঠে বলেছিলেন, ' তাহলে কষ্টেই মরে যাবোরে। এই বছরের মধ্যে যুদ্ধ শেষ না হলে আর বাঁচবো না।'

কে জানে, যুদ্ধ কবে শেষ হবে।

কেন যুদ্ধ হয় ? কেন মায়ের বুক খালি করে ছেলেরা যুদ্ধে যায় ? কেন হাসি হাসি মুখ করে ছেলেরা বলে 'বিদায় দে মা ঘুরে আসি ?' ওরা তো জানেই, সবাই ফিরে আসতে পারবে না, তবু কেন ওরা অমন হাসি হাসি মুখে মায়ের বুক ভরা ভালোবাসা পেছনে ফেলে যুদ্ধে চলে যায় ? স্বাধীনতার যুদ্ধে যেতে হয় বলে।

অবশেষে সত্যি সত্যিই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ লেগে গেল। তিন ডিসেম্বর। পাকিস্তানি রেডিওতে বলা হ'ল : তিন ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে চারটেয় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের শিয়ালকোট, চম্ব, লাহোর এসব জায়গায় স্থল ও বিমান আক্রমণ শুরু করে। সুতরাং পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীকেও বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার জন্য ভারতীয় সীমান্তের কতকগুলো জায়গায় পাল্টা আক্রমণ করতে হয়। অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে বলা হল, পাকিস্তানই প্রথম আক্রমণ করেছে বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। তারা ভারতের খেমকারান, অমৃতসর, শ্রীনগর, যোধপুর, আগ্রা—এসব জায়গায় স্থল ও বিমান হামলা চালিয়েছে।

প্রথম আক্রমণ যে-ই করুক না কেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ যে শুরু হয়ে গেছে, তাতে আর সন্দেহ রইল না। কেননা সকাল থেকেই দেখা গেল, ঢাকার আকাশে ভয়ানক কড়কড় শব্দে প্লেন উড়ে যাচ্ছে। ভারতীয় প্লেন দেখামাত্র তীব্র স্বরে এয়ার রেইড সাইরেন বেজে উঠছে। শব্দে চারদিক ঝালাপালা।

মা ভেতরে ভেতরে খুব উত্তেজনা বোধ করেন। যুদ্ধ তা' হলে সত্যি সত্যি লেগেছে। রেডিওতে খানিক পরপরই ঘোষণা করা হচ্ছে : সাইরেন শুনলে কিভাবে নিকটবর্তী ট্রেঞ্চ কিংবা বাড়ির সিঁড়ির নিচে আশ্রয় নিতে হবে, কিভাবে দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে উবু হয়ে বসতে হবে-- এই সব নির্দেশ। আরো কত রকমের নিষেধবাণী। কিন্তু ঢাকার লোকেরা ওসব সাইরেন, বিধিনিষেধ কিছুই মানছে না। এয়ার রেইড সাইরেন শোনামাত্র সবাই দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছে আর ছাদে উঠে যাচ্ছে। সবার ধারণা, ভারতীয় প্লেন বেসামরিক লোকবসতির ওপর বোমা ফেলবে না। তাদের লক্ষ্য কেবল ক্যান্টনমেন্ট আর ঢাকা বিমানবন্দর। তাই সবাই ভারতীয় প্লেন দেখতে, আকাশ-যুদ্ধ দেখতে রাস্তায় আর ছাদে ভিড় জমাচ্ছে। মা-ও মাঝে মাঝে ছাদে ওঠেন আকাশ-যুদ্ধ দেখতে। শরীফ আর জামী তো প্রায় সর্বক্ষণই ছাদে। মা বেশি সময় ছাদে থাকতে পারেন না, কারণ সংসারের কাজকর্ম আছে। অন্ধ শ্বশুরের দেখাশোনা আছে। তাছাড়া আরো হাজারটা কাজ আছে। যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর থেকে সকাল পর্যন্ত পূর্ণ নিষ্প্রদীপ পালন করতে হচ্ছে। সেজন্য ঘরের ভেতরের বাল্‌বে কালো কাগজের শেড পরাতে হবে। বাতি জ্বাললে যাতে আলোর রেখা জানালা দিয়ে ঘরের বাইরে না যায়। তাছাড়া, জানালার কাচে কাগজের ফালি আঠা দিয়ে সাঁটতে হবে। বোমা পড়লে যাতে কাচ ভেঙে ছিটকে ঘরে ছড়িয়ে লোকজন জখম না করে। এসব কাজে মাকে সাহায্য করে ভাগনে লুলু।

যুদ্ধ ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠছে। এয়ার রেইড সাইরেনও ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে। আকাশে ভারতীয় ও পাকিস্তানি প্লেনের যুদ্ধও

ঘন ঘন দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, বেসামরিক এলাকায় সত্যি সত্যিই কোন বোমা পড়ছে না। কিন্তু একেবারেই যে পড়বে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি ? অত উঁচু থেকে কি সামরিক-বেসামরিক এলাকা অত হিসেব ক'রে বোমা ফেলা সম্ভব ? দু'চারটে ছিটকেও তো এসে পড়তে পারে ? তাই মা দু'দিন পরেই বাবাকে বললেন, একতলার সিঁড়ির নিচে সবার শোয়ার ব্যবস্থা করে ফেলতে। যুদ্ধকালীন সময়ে এইটাই নিয়ম। বোমাবর্ষণের সময় সিঁড়ির নিচটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।

বাবা, জামীকে সঙ্গে নিয়ে ঘন্টা দুয়েক কাজ ক'রে সব ঠিক ক'রে ফেললেন। দোতলা থেকে দুটো খাট নামিয়ে জোড়া দিয়ে বেশ বড়ো বিছানা পাতা হল, যাতে বাবা, মা, জামী, জামীর দাদা সবাই পাশাপাশি শুতে পারেন। দাদা চোখে দেখেন না, তাঁর বসবার ইজিচেয়ারটাও নিচে আনা হল। দিনের বেলা তিনি ওটায় বসে থাকবেন।

ঢাকায় বিমান হামলা ছাড়াও দেশের সর্বত্র—রংপুর, দিনাজপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, ফেনী, সিলেট—সব জায়গায় যেভাবে যুদ্ধ চলছে, তাতে মুক্তিবাহিনীর ঢাকায় ঢুকে পড়তে আর দেরি নেই। বাবা রোজ স্বাধীন বাংলা বেতার, বিবিসি, আকাশবাণী এসব শোনেন, রোজ চার পাঁচটা খবর কাগজ পড়ে খবর বিশ্লেষণ করেন। মাকে বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক ক'টা দল বিভিন্ন দিক দিয়ে ঢাকার পানে এগোচ্ছে। খুব শিগগিরই তারা ঢাকায় ঢুকবে। তখন রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। তখন আমরা যারা শহরের মধ্যে আছি আমাদেরকে ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। যুবক ছেলেরা ওদের সঙ্গে যোগ দেবে পথ-যুদ্ধে, আমরা বয়স্করা ওদের খাবারের যোগান দেব, ওরা যখম হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করব, ওষুধ তৈরি রাখব। তুমি কিন্তু এখন থেকেই চাল, ডাল, আলু, বিস্কুট এসব কিনে রাখতে শুরু কর। এই সঙ্গে টিংচার আয়োডিন, বেঞ্জিন, তুলো, ব্যাণ্ডেজের কাপড়—'

মা বাধা দিয়ে হেসে বলেন, 'এসব জিনিস তো কবে থেকেই একটু একটু করে কেনা হচ্ছে। ঘরের মেঝেয় সব টাল হয়ে রয়েছে। সোয়েটার, মোজা, মাফলার, ওষুধ যে এত কিনলাম, তাও তো কেউ নিতে এল না। সব পড়ে আছে।'

বাবা বলেন, 'প'ড়ে থাকবে না, প'ড়ে থাকবে না। ঢাকায় কতদিন যুদ্ধ চলবে কে জানে ? তোমার সোয়েটার, মোজা, মাফলার, ওষুধ-পত্র সব কাজে লেগে যাবে, দেখো।'

মা রোজ একটু একটু করে চাল, ডাল, পেঁয়াজ, বিস্কুট কেনেন আর ঘরে এনে স্তূপাকার করেন আর প্রতীক্ষা করে থাকেন কবে মুক্তিবাহিনী এসে ঢাকায় প্রবেশ করবে। জামী প্রতীক্ষা করে থাকে কবে সে একটা স্টেনগান হাতে নিয়ে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়বে, মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধ করবে। ভাইয়া যখন যুদ্ধে যায় তখন সেও যাবার জন্য জেদ ধরেছিল। কিন্তু দুই ভাই একসঙ্গে চলে গেলে জামীর বুড়ো, অন্ধ

দাদাকে বুঝ দেওয়া সম্ভব হবে না। পাড়ার লোকেও সন্দেহ করবে, এই সব চিন্তা করে তাকে যেতে দেওয়া হয় নি। এখন সে দিন গুনছে কখন যুদ্ধে যোগ দিতে পারবে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা যে আসছে না। এদিকে ঢাকার জীবন একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে। প্লেনের কড়কড় শব্দ। সাইরেনের তীক্ষ্ণ চিৎকার ঢাকাবাসীর

গা–সওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু ক'দিন থেকে কি যে উল্টোপাল্টা কারবার আরম্ভ হয়েছে। যখন তখন সরকার কারফিউ দিচ্ছে। সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত কারফিউ তো আছেই, তারপর দিনেও প্রায়ই কয়েক ঘন্টার জন্য কারফিউ দিচ্ছে। ১২ ডিসেম্বর সারাদিনই কারফিউ উঠল না।

মা, বাবা কেউই বুঝতে পারছেন না কেন দিনের বেলাতেও এই রকম এলোপাতাড়ি কারফিউ দেওয়া হচ্ছে। জামী ছাদ থেকে লক্ষ্য করেছে কারফিউয়ের মধ্যেই রাস্তা দিয়ে সাদা রঙের অনেক মাইক্রোবাস যাতায়াত করে। ওগুলো তো মিলিটারি গাড়ি নয়। তাহলে কি কাজে ওগুলো কোথায় যাতায়াত করে ? জামীরা কেউ টের পায় নি। ওদের কল্পনাতেও আসে নি, কেন অত প্লেনের আনাগোনা, বোমাবর্ষণ, কারফিউয়ের মধ্যেও বেসামরিক মাইক্রোবাস, মোটর গাড়ি চলাচল করছে। ওই সব গাড়িতে করে তখন রাজাকার-আলবদরের ছোট ছোট দল বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর রায়ের বাজারের একটা জায়গায় গুলি করে মেরে ফেলে দিচ্ছে। মা, বাবা, জামীর আর কোন কাজ নেই। কারফিউ থাকলে বাসার মধ্যে। কারফিউ উঠলে মা যান বাজারে, বাবা অফিসে, জামী বাসায় থেকে দাদার দেখাশোনা করে। কাজের লোকজন সেই কবেই চলে গেছে। নিজেদের কাজ নিজেদেরই করে নিতে হয়।

১৩ ডিসেম্বর বিনা মেঘে বজ্রপাত। দুপুর দুটোর দিকে হঠাৎ বাবার বুকে ব্যথা শুরু হল, সারা শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছে। খবর পেয়ে প্রতিবেশী ডাক্তার খান এসে দেখে বললেন, 'প্রথম হার্ট অ্যাটাক। এক্ষুণি হাসপাতালে নেওয়া দরকার।'

আরেক প্রতিবেশী ডাক্তার রশীদ পি. জি. হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট। তাকে ব'লে খুব তাড়াতাড়ি এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা সম্ভব হল। এ্যাম্বুলেন্সে বাবার সঙ্গে মা এবং ডাঃ খানও চললেন হাসপাতালে। কিন্তু সবার সব চেষ্টা বিফল করে বাবা চলে গেলেন, সবাইকে পেছনে ফেলে।

মা দিশেহারা হয়ে পড়লেন। ছেলে আগেই গেছে, এবার স্বামীও গেল। কি করবেন তিনি এখন ? ব্ল্যাকআউট, প্লেনের কড়কড়ানি, সাইরেনের তীক্ষ্ণ চিৎকার—এর মধ্যে কোথায় পথ, কোথায় উদ্ধার ? মার যে আর সহ্য হয় না। এর মধ্যে আরেক বিপদ, সামনের দুটো বাড়ির ছাদে বোমা পড়ে কয়েকজন মারা

গেছে, কয়েকজন মারাত্মক জখম হয়েছে। ওসব বাড়ির লোকেরা ভয় পেয়ে সবাই মিলে এ বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ফলে এতগুলো লোকের দেখাশোনার ভারটা মায়ের ওপর পড়েছে। এত বিপদ, বিপর্যয় যন্ত্রণায় তিনিই বা বেঁচে আছেন কি করে? সে কি ঐ অন্ধ শ্বশুর আর কিশোর ছেলের মুখ চেয়ে? জামীরও যে আর কেউ রইল না মা ছাড়া। ছেলের জন্যই যে তাঁকে বাঁচতে হবে। দুঃখের অমানিশা এক সময় শেষ হয়। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়। উল্লাসে সবাই ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে গেছে। মা কোথাও

বেরোন নি। আধা-মূর্ছিতের মতো বিছানায় পড়ে আছেন। দলে দলে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আসছে, মায়ের বিছানা ঘিরে বসে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, বিলাপ করছে। মা কিছু বলতে পারছেন না। সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, ভাবছেন—এরা তো সবাই এই ঢাকাতেই ছিল, বিপদে, দুঃখে সবসময় ছুটে এসেছে, সাহায্য করেছে। এখনও দারুণ দুঃসংবাদ পেয়ে এসে চোখের পানি ঝরাচ্ছে। কিন্তু যারা মনে মনে 'বিদায় দে মা' বলে যুদ্ধে গিয়েছিল, তারা কই ? মা শুনেছেন, মুক্তিযোদ্ধারা চারদিক দিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করেছে। রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ আর করতে হয় নি, তার আগেই নব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্যসহ জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেছে। মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকায় ঢুকেছে বিজয়ীর বেশে। তাদের স্টেনগানের গুলির ফাঁকা

আওয়াজে আকাশ মুখরিত। তিনি যে এখন তাদেরকেই দেখতে চান।

ফোন লাইন, বিদ্যুতের লাইন সব বিচ্ছিন্ন। সারতে এখনো দু'চার দিন লাগবে মনে হচ্ছে। ১৭ তারিখে সন্ধ্যার পর একটা মোমবাতি জ্বেলে মা জামীকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসেছিলেন। হঠাৎ দরজায় করাঘাত। তার আগে বাসার সামনে জীপ থামার শব্দ শোনা গেছে। মা উঠে দরজা খুললেন। কাঁধে স্টেনগান ঝোলানো কয়েকজন তরুণ দাঁড়িয়ে। মা দরজা ছেড়ে দু'পা পিছিয়ে বললেন, 'এসো বাবারা এসো।'

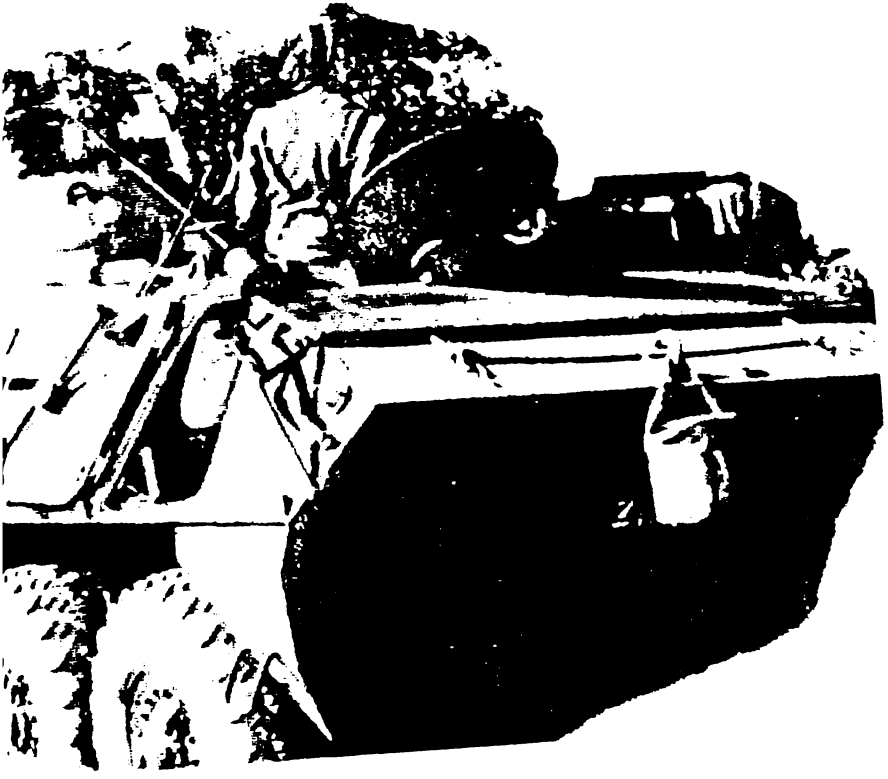
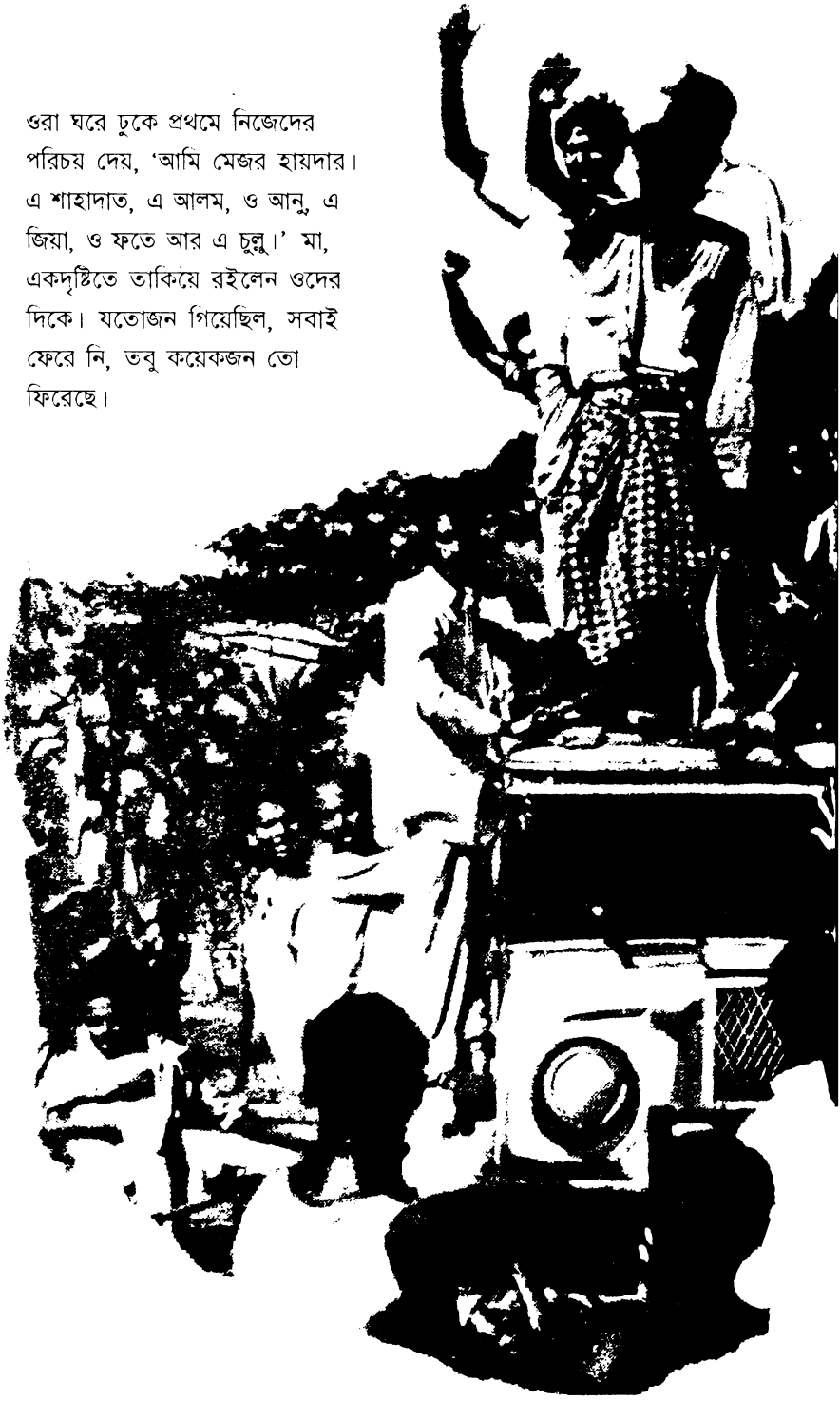
ওরা ঘরে ঢুকে প্রথমে নিজেদের পরিচয় দেয়, 'আমি মেজর হায়দার। এ শাহাদাত, এ আলম, ও আনু, এ জিয়া, ও ফতে আর এ চুল্লু।' মা, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ওদের দিকে। যতোজন গিয়েছিল, সবাই ফেরে নি, তবু কয়েকজন তো ফিরেছে।